আগাথা ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে

তাহলে কে

উর্মি রহমান

তাহলে কে ?

আগাথা ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে

উর্মি রহমান

সম্পূর্ণ এ-দেশী পটভূমিতে
লেখিকার শক্তিশালী কলমের আঁচড়ে
ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য কাহিনী।
মাকে খুন করার অপরাধে
শাস্তি হয়ে গেল ডানপিটে জাফরের।
কারাগারে মৃত্যু ঘটলো ওর নিউমোনিয়ায়।
কিন্তু দু'বছর পর নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল
জাফর নির্দোষ।
মহা ঝামেলায় পড়লো পুলিশ।
পরিবারেরই কেউ খুন করেছে রাহেলা চৌধুরীকে।
জাফর যদি না করে থাকে—
তাহলে কে ?

এগারো টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

তাহলে কে ?

আগাথা ক্রিস্টির
কাহিনী অবলম্বনে

উর্মি রহমান

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৩

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রহমান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, পাঁচভাই ঘাট লেন, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

TAHOLEY KAY
by URMI RAHMAN

তাহলে কে?

উর্মি রহমান

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

ফেরীঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আরো আগে আসা যেতো। নিজেরই গড়িমসিতে দেরি হলো। না এসে অবশ্য কোনো উপায় ছিলো না তাঁর। একটা অপরাধবোধ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

নৌকার মাঝির চোখে-মুখে কৌতূহল—তাঁকে বেশ বিব্রত করলো। অবশ্য কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক। খালি হাতে অর্থাৎ কোনো মাল-পত্র ছাড়া সাধারণতঃ এ সময় কেউ ওপারে যায় না। আগন্তুক যে থাকতে আসেননি তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তার মানে তিনি আবার শহরে ফিরে যাবেন।

নদীর পানিতে বৈঠার ছপছপ শব্দ শুনতে শুনতে অন্য কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। ভাবতে গিয়ে অপরাধবোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। অবশ্য তাঁর করারও কিছু ছিলো না।

নৌকা ঘাটে ভিড়লো। মাঝির হাতে পয়সা দিতে দিতে তিনি জানতে চাইলেন, 'সূর্যমহলটা কোনদিকে বলতে পারো?'

'সুয্যিমহল। সোজা ডাইনে যান, শ্যাষে বাঁয়ে দশ গজ গেলি পরেই সুয্যিমহল।'

'ধন্যবাদ।'

মাঝির কৌতূহল তীব্র হতে দেখে তিনি আর দাঁড়াতে চাইলেন না। কিন্তু তার কথা শুনে দাঁড়াতে হলো।

'আমরা কই নাগমহল।'

'নাগমহল?'

'হ'। ওই জায়গার নাম আছিলো নাগের ঢিবি। শ্যাষে ওইখানে দালান উঠলি পরে হক্কলে নাম রাখলো নাগমহল। পরে হুনছি নতুন মালিক নাম রাখছে সুয্যিমহল।'

'ও।'

চিন্তিতভাবে পা বাড়ালেন তিনি। নাগমহল! নামটায় কেমন যেন অশুভ একটা গন্ধ আছে।

নাম সেকেলে হলেও বাড়িটা কিন্তু আধুনিক। দোতলা এবং সুদৃশ। নদীর ঠিক পাড়েই। গেটের পাশে নাম খোদাই করা আছে। তবে বড় বেশি নির্জন। তিনি শুনেছেন বাড়িটার বর্তমান বাসিন্দা আনিস চৌধুরী এটি কিনেছেন। পছন্দ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী···।

কলিং বেল-এ আঙুল রাখলেন। দরজার কাঁচে তাঁর ছায়া পড়লো। একটু বিব্রত দেখাচ্ছে।

এতদিন পর···।

দরজা খুলে গেলো। একজন সুশ্রী তরুণীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির

সামনে পড়লেন তিনি। সন্দিগ্ধ অথচ বিষণ্ণ।

মেয়েটি জানতে চাইলো, 'কাকে চাই ?'

'আনিস চৌধুরী আছেন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি কারো সাথে দেখা করেন না।'

'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'সবাই ওকথা বলে।' বিরক্ত হলো মেয়েটি।

'ব্যাপারটা খুবই জরুরী।'

'জানি। আপনি নিশ্চয় খবরের কাগজের লোক। যা শেষ হয়ে গেছে···।'

'আপনি ভুল করছেন। আমি সাংবাদিক নই। আমার নাম ডঃ কায়সার।'

মেয়েটি একটু থমকালো। 'আপনি কি চান ?'

'আপনি বোধহয় চৌধুরী সাহেবের মেয়ে ? আমি এসেছি আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে।'

'মাসুদ ?'

'না, জাফর চৌধুরী।'

'জাফর ! জানতাম। কেন আপনারা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না। সব যখন শেষ হয়ে গেছে।'

'সত্যি কি সব শেষ হয়ে গেছে ?'

মেয়েটি অসহিষ্ণুভাবে বললো, 'হ্যাঁ, জাফর মারা গেছে আজ এক বছর। দোহাই লাগে, আমাদের আর বিরক্ত করবেন না। বাবা ব্যস্ত।'

'মাহতাব সাহেব আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।'

'মাহতাব সাহেব ? ঢাকা থেকে ?'

'হ্যাঁ।'

মেয়েটি চিঠি হাতে নিয়ে খামের উপর একবার চোখ বুলিয়ে দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেলো। দরজায় আরো একজনকে দেখা গেলো। মধ্যবয়সী, সামান্য রুক্ষ, সন্দিগ্ধ মুখ। অনেকটা বৈষ্ণবী ধাঁচের চেহারা। আগের মেয়েটির গলা শোনা গেলো, 'বাবা ওঁকে ভেতরে আসতে বলেছেন।'

মধ্যবয়সী মহিলাটি অনিচ্ছার সাথে দরজা খুলে ডঃ কায়সারকে ঢুকতে দিলো। মেয়েটির ইশারায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন তিনি।

দোতলায় উঠে মেয়েটি একটা ঘরের দরজা খুলে ধরলো। ডঃ কায়সার ভেতরে ঢুকলেন। একটি লাইব্রেরি ঘর। বড় বড় শেল্‌ফে বই রাখা। রাইটিং টেবিলে স্তূপাকারে কাগজপত্র। ঘরে তিনটে বেতের চেয়ার, ছোট্ট বেতের গোল টেবিল এবং একটা ইজি চেয়ারও আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

'আসুন ডঃ কায়সার। আমিই আনিস চৌধুরী।'

হাত মেলালেন ডঃ কায়সার। তারপর দু'জনেই বসলেন। আনিস চৌধুরী রাইটিং টেবিলের পাশে দাঁড়ানো আর একটি তরুণীকে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত, রেহানা। তুমি এবার বিশ্রাম নাও। হাসি, খোদেজাকে বলিস এখানে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।' দু'টি মেয়েই বেরিয়ে গেলো। আনিস চৌধুরী ডঃ কায়সারের দিকে ফিরলেন।

'মাহতাব সাহেব লিখেছেন আপনি আমার ছেলে জাফর সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে এসেছেন।'

'হ্যাঁ। ভাবলাম, চিঠিতে না লিখে নিজেই জানিয়ে যাই। আসলে কথাটা না জানানো পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'এতদিন পর আপনি কি জানাতে এসেছেন জানি না। যদিও আমি বিশ্বাস করি না, যা ঘটে গেছে তার জন্য জাফর দায়ী। তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না, ও বড় অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে ছিলো।'

ডঃ কায়সার কিছু বলার আগেই দরজা খুলে গেলো। গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলো হাসি। বাবার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো। আনিস চৌধুরী বললেন, 'হাসি মা, তুমি বরং এখন তোমার ঘরে যাও।'

'আমি সব শুনতে চাই। জাফর নতুন আর কি ঘটনা ঘটিয়েছিলো আমি জানতে চাই।' হাসির কণ্ঠের তিক্ততা ঢাকা পড়লো না। বিব্রত হলেন আনিস চৌধুরী। রেহানা খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কাঁধে ঝোলা। ডঃ কায়সার এবার তাকে ভালো করে দেখলেন। মেয়েটি সুন্দরী। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে।

'আমি তাহলে আজ যাই।'

'না রেহানা, ভেতরে এসো। ডঃ কায়সার আমাদের কিছু বলতে এসেছেন। তোমারও শোনা দরকার।'

রেহানা ঝোলাটা রাইটিং টেবিলের সামনের চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলো। আনিস চৌধুরী বললেন, 'বোসো।'

রেহানা বসলো।

'ডঃ কায়সার, রেহানা আমার সেক্রেটারী। আপনার যা বলার এদের সামনেই বলুন।'

'দেখুন, বিষয়টা আমার জন্য বড় বিব্রতকর। তবু কথাটা যখন বলতেই হবে...'

'কেন বলতেই হবে। সব তো শেষ হয়ে গেছে। জাফরের সমস্ত কীর্তিকলাপের দায়িত্ব নিশ্চয় আমরা নেবো না।' বললো হাসি।

'আপনি ভুল করছেন। আমি জাফরের বিরুদ্ধে কিছু বলতে আসিনি।'

আনিস চৌধুরী বললেন, 'ডঃ কায়সার, ভূমিকার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি সোজাসুজি কথাটা বলে ফেলুন। আমরা শোনার জন্য প্রস্তুত।'

'বেশ। আমি একজন ভূপদার্থবিদ। আমাকে বছরখানেকের জন্য বিদেশ যেতে হয়েছিলো। সম্প্রতি দেশে ফিরেছি। এসব কথা হয়তো আপনাদের অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু কেন আমি আপনাদের কাছে এতদিন পর এলাম, এই কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই এসব বলতে হচ্ছে। ভূমিকাটা লম্বা ...।'

আনিস চৌধুরী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই। আপনি সময় নিয়ে বলুন।'

'আমি এই মামলা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। সম্প্রতি জেনেছি। আমি ঘটনা বর্ণনা করছি, আপনারা দেখুন কোনো

ভুল আছে কিনা।' সবাই নিঃশব্দে শুনতে লাগলো।

'ঘটনা ঘটে গত বছরের আগের বছর নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ সন্ধ্যা ৬টার দিকে। আপনার ছেলে জাফর চৌধুরী তার মায়ের সাথে দেখা করে জানায় যে সে বিপদগ্রস্ত এবং তার কিছু টাকার দরকার। এ রকম আগেও ঘটেছে।'

'অনেকবার,' বললেন আনিস চৌধুরী।

'মিসেস চৌধুরী টাকা দিতে অস্বীকার করলে দু'জনে বচসা হয়। জাফর মাকে শাসায়। বলে, 'তুমি নিশ্চয় চাও না আমি জেলে যাই?' আপনার স্ত্রী বলেন, 'সেটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা।'

'আমি এবং আমার স্ত্রী অনেকবার ওকে শোধরাতে চেষ্টা করেছি। রাহেলা ক্ষমা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে জাফরকে কাছে টানতে চেয়েছেন, ভালো করতে চেয়েছেন।' আনিস চোধুরীর গলা ধরে এলো।

ডঃ কায়সার আবার শুরু করলেন, 'জাফর চলে গেলো। সেদিন রাত্রেই খুন হলেন রাহেলা চৌধুরী, আপনার স্ত্রী। লোহার রড দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়। রডে জাফরের হাতের ছাপ পাওয়া যায়। মৃতদেহের পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে যে টাকা চুরি গিয়েছিলো, তা-ও পাওয়া যায় জাফরের পকেটে। পুলিশ তাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করে চট্টগ্রাম শহর থেকে। জাফর নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে। সে বলে হত্যার সময় সে চট্টগ্রামের পথে ছিলো। তাকে লিফট্ দেন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। অন্ধকার থাকায় সে গাড়িটির মডেল বলতে

পারেনি, তবে রং সাদা। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ওরকম কোনো লোককে খুঁজে পায়নি। এবং মিসেস রাহেলা চৌধুরীকে হত্যার অভিযোগে জাফর চৌধুরীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।'

ডঃ কায়সার একটু থামলেন। ঘরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। সবার মুখ থমথমে। তিনি আবার বললেন, 'কারাগারে ছ'মাস পর নিউমোনিয়া হয়ে জাফর মারা যায়। আমার বর্ণনায় কি কোনো ভুল আছে?'

'না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এতসব কথা আপনি কেন বলছেন। এসব আমরা ভুলে থাকতে চাই।'

আনিস চৌধুরীর কণ্ঠে বেদনার আভাস।

'আমাকে ক্ষমা করুন। সব কিছু না বললে আমার কৈফিয়ৎটা স্পষ্ট হবে না। আপনারা কি মনে করেন জাফর দোষী?'

'সমস্ত প্রমাণ তাই বলেছে,' বললো হাসি।

'না।'

'না?' সবাই বিস্মিত হলো।

'ডঃ কায়সার, আমার মতো আপনিও কি মনে করেন জাফর রাহেলাকে খুন করেনি?'

আনিস চৌধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন ডঃ কায়সার, 'শুধু মনে করি না, আমি জানি। জাফর খুন করতে পারে না। কারণ সে ওই সময় আমার গাড়িতে চাটগাঁ যাচ্ছিলো।'

'আপনি!!' রেহানা ও হাসি এক সাথে বলে উঠলো।

ঠিক এই সময় সশব্দে দরজা খুলে গেলো। চা ও নাস্তার ট্রেসহ ঘরে ঢুকলো মধ্যবয়সী বৈষ্ণবী ধাঁচের সেই মহিলা, 'উনি কি বলতে এসেছেন আমি শুনতে চাই।'

'নিশ্চয়,খোদেজা। তুমি তো আমাদের পরিবারেরই একজন। উনি বলছেন, আসলে জাফর রাহেলাকে খুন করেনি। সে ওই সময় ওঁর সাথে ছিলো।'

'কেন আপনি অযথা বিরক্ত করতে এসেছেন ? যা ঘটেছে আমরা তো তা মেনেই নিয়েছি।'

ডঃ কায়সার এ কথার কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। এগিয়ে দেয়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, 'আমি রাঙামাটি থেকে কাজ সেরে ফিরছিলাম। পথে জাফরকে তুলে নিই। আমরা পথে কথাবার্তা বলি। আমার তাকে বেশ আকর্ষণীয় তরুণ বলে মনে হয়েছিলো।'

রেহানা বললো, 'সত্যিই মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিলো ওর।'

'আমি তাকে নাসিরাবাদে যখন নামাই তখন রাত ৯টা বাজে। আর আপনার স্ত্রী খুন হন ৭-৩০ থেকে ৮ টার মধ্যে।'

'কেন আপনি এতদিন পর এলেন ? তখন কেন আসেননি ! কেন আপনি এতো নিষ্ঠুর ! এতো স্বার্থপর !' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলো হাসি।

'আনিস চৌধুরী বললেন, 'হাসি, মা। ওঁকে বলতে দে।'

'ক্ষমা চাইলেন ডঃ কায়সার, আমি জানি আপনাদের মানসিক অবস্থা কি। আমার মনের অবস্থাও অনেকটা সেরকম।

তবু সব কথা বলতে পারলে হয়তো আমি কিছুটা হালকা হবো।'

রেহানা নরমভাবে বললো, 'আপনি বলুন।'

'জাফরকে নামিয়ে দেবার পর আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে গাড়িটা রাখি। ওটা তাঁরই ছিলো। এরপর আমি রিক্সায় চড়ে রাত সাড়ে দশটার ঢাকা মেল ধরতে স্টেশনে যাচ্ছিলাম। পথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমি জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফেরে দু'দিন পর, তখন আমি আগের ঘটনা আর মনে করতে পারছি না। আমাকে ঢাকা নিয়ে গিয়ে একটা ছোটখাটো অপারেশন করা হয়। স্ট্রেইন পড়বে বলে সেই ক'দিন আমাকে রেডিও শুনতে বা কাগজ পড়তে দেয়া হয়নি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর দিন চারেক দেশে ছিলাম, কিন্তু আগের ঘটনা মনে না পড়ায় আমি বুঝতে পারিনি 'সূর্যমহল হত্যা রহস্যের' সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। তা' ছাড়া খুন-জখমের খবর-পড়তে কোনদিনই আমি তেমন উৎসাহবোধ করি না।' এক-টানা কথা বলে ডঃ কায়সার হাঁপিয়ে উঠলেন।

আনিস চৌধুরী বললেন, 'চা খেয়ে নিন।'

চা শেষ করে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'সম্প্রতি দেশে ফিরে আমি হঠাৎ এই ঘটনা আবিষ্কার করি। কিছু নমুনা প্যাক করার জন্য কাগজ চাইলে চাকরটা পুরনো কাগজ এনে দেয়। তারই একটায় জাফরের ছবি ছিলো, মুখটা চেনা চেনা লাগলেও ভালো করে বুঝতে পারলাম না। এরপর আমি লাইব্রেরীতে গিয়ে খুঁজে পেতে মামলার বিবরণ পড়লাম। তখন আস্তে আস্তে সব মনে পড়লো। মাহতাব সাহেবের নাম

কাগজেই দেখেছিলাম। তাঁর কাছে গেলাম এবং পুলিশের কাছে সব বললাম।'

'পুলিশ আপনার কথা বিশ্বাস করলো?' হাসির কণ্ঠে বিদ্রুপ মেশানো অবিশ্বাস।

ডঃ কায়সার হাসলেন, 'নিশ্চয়। আমার মোটামুটি একটা পরিচিতি আছে দেশে। যাই হোক। মাহতাব সাহেব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কথাটা তুলবেন। তিনিই আপনাদের সব জানাতেন। তবু আমি এলাম কেননা অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। জাফর ফিরে আসবে না জানি। কিন্তু তার স্মৃতির প্রতি সুবিচার হোক, এটুকুই আমি এখন চাই।'

রেহানা বললো, 'সবই ভাগ্যের ব্যাপার, আপনারও কিছু করার ছিলো না।'

'একটা খবর দিয়ে যাই। জাফর কোনো অপরাধ না করেই দণ্ড পেয়েছে, এবং নির্দোষ প্রমাণ হবার আগেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বোধহয় তার দণ্ড মওকুফের ব্যবস্থা করবেন। খবরের কাগজেও একথা লেখা হবে। তবে মাহতাব সাহেব আগেই আপনাদের কোনো আশা দিতে চান না।'

আনিস চৌধুরী সোজা হয়ে বসলেন, 'মওকুফ! আশা!!'

ডঃ কায়সার উঠে দাঁড়ালেন, 'ক্ষমা করবেন। কথাটা এভাবে বলতে চাইনি। আমার আর কিছু বলবার নেই। আবার ক্ষমা চেয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।'

কেউ কথা বললো না। এমন কি নড়লো না পর্যন্ত। স্তব্ধ

হয়ে বসে রইলো। শুধু রেহানা কাছে এসে নিচু স্বরে বললো, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে ডঃ কায়সার বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসার পর পিছনে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন। খোদেজা নেমে এসে দাঁড়ালো।

'যা মুছে গিয়েছিলো, তাকে কেন জাগালেন।' রুক্ষস্বরে জানতে চাইলো সে।

'জাফরের স্মৃতি থেকে কলঙ্কের দাগ মুছে ফেলা উচিৎ। আমার মনে হয় তাতে এঁরা স্বস্তি পাবেন,' শান্তভাবে বললেন ডঃ কায়সার।

না। আপনি এদের চেনেন না, আমি চিনি। আমি আঠারো বছর ধরে এদের সাথে আছি। রাহেলা বুবুর সাথে এসেছিলাম, তিনি আজ নেই, আমি রয়ে গেছি তাঁর ছেলে-মেয়েদের দেখা শোনা করার জন্য। আমি এদের সবাইকে ভালবাসি। এদের যন্ত্রণা আপনি বাড়িয়ে গেলেন।'

খোদেজা একথা বলেই পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলো।

ডঃ কায়সার পা বাড়ালেন।

'শুনুন।'

আবার থামতে হলো। এবার হাসি। তার মুখও থমথমে।

'কেন আপনি এলেন?'

'আপনি কি চান না আপনার ভাইয়ের মিথ্যে কলঙ্ক দূর হোক?' অসহায় ভাবে বললেন ডঃ কায়সার।

'কি হবে? সে তো বেঁচে নেই। বেঁচে আছি আমরা। আমরা, যারা নির্দোষ। আপনি জানেন না, আমাদের কি ক্ষতি আপনি করে গেলেন।' আর্তস্বরে কথা ক'টি বলে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো হাসি। বিমূঢ় ডঃ কায়সার দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

হাসি সিঁড়িতে পা দিতেই কাঁধে কেউ একজন হাত রাখলো। ঘুরে দেখে খোদেজা। খোদেজা বললো, 'চলে গেছেন উনি?'

'হ্যাঁ।'

'এভাবে এরকম একটা খবর আসবে ভাবিনি। ওঁর এভাবে আসা ঠিক হয়নি।'

'তাঁর দিকে থেকে কাজটা ঠিকই হয়েছে, নরম সুরে বললো হাসি, 'ওঁর সাহসের প্রশংসা করা উচিৎ। এতদিন পর দণ্ড প্রাপ্ত আসামীর পরিবারকে এসে জানানো যে, সে খুন করেনি। কাজটা সহজ নয়, বুয়া। তবু আমার মনে হচ্ছে, এ সাহসটুকু তিনি না করলেই আমাদের মঙ্গল হতো।'

'ঠিকই বলেছো।'

'আমি একটু বাবার কাছে যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যাও। তিনি কি বলেন, শোনো।'

হাসি ঘরে ঢুকে দেখে রেহানা টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। আনিস চৌধুরী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মুখে চিন্তার রেখা। হাসিকে দেখে বললেন, 'মণি আর মাসুদকে ফোনে ধরতে বললাম। ওদের আসতে বলবো। আমাদের সবার এক

জায়গায় হওয়া দরকার। কি বলিস ?'

'হ্যাঁ, বাবা। মাহতাব সাহেবকেও ডাকলে হয়।'

'তাঁকেও খবর দেবো।'

রেহানা ফোনে বললো, 'মণি ? তোমার বাবা কথা বলবেন। একটু ধরো।'

আনিস চৌধুরী ফোন ধরলেন, 'মণি, কেমন আছিস, মা ? ফরহাদের শরীর এখন কেমন ?···একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে মা। কে এক ডঃ কায়সার এসেছিলেন। তিনি বললেন, জাফর নির্দোষ। সে রাতে তিনি তাকে লিফ্‌ট দিয়েছিলেন।···ফোনে তোকে সব খুলে বলতে পারছি না।···তিনি কেন এতদিন পরে এলেন, সেটাও বলেছেন।···হ্যাঁ। হ্যাঁ বিশ্বাসযোগ্যই। আমার মনে হয়, তোদের একবার আসা দরকার।··না, সে তো জানিই। কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী, মা।···আচ্ছা ঠিক আছে। পরে ফোন করে জানাস। রাখি তাহ'লে।'

হাসি বললো, 'আমি একটু মামুনকে ফোন করবো।'

রেহানা বললো, 'আজ ওর সাথে তোমার বাইরে যাবার কথা না ?'

হাসি ফোনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'কথা ছিলো। যাবো না।'

আনিস চৌধুরী বললেন, 'গেলেই পারতি মা। মনটা হয়তো···'

'না, বাবা। আজ আমি কোথাও যাবো না।' রিসিভার তুলে ডায়াল করলো হাসি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললো,

'মামুন ? আমি হাসি ।···হ্যাঁ। শোনো, আজ আমি বাইরে যাবো না। ··না, শরীর ভালো আছে।···এক মিনিট ধরো।'

রিসিভারের উপর হাত রেখে সে বাবার দিকে ফিরলো, 'বাবা, ব্যাপারটা কি গোপন ? মামুনকে বলবো ?'

আনিস চৌধুরী ইতস্তত করে বললেন, 'না, মামুনকে বলতে পারিস। কিন্তু ও যেন কাউকে না বলে। আমি চাই না, এখনি এ নিয়ে কোনো কথাবার্তা হোক।'

হাসি রিসিভার থেকে হাত সরিয়ে বললো, 'মামুন একটা খারাপ খবর আছে। এক ভদ্রলোক এসে জানিয়ে গেছেন জাফর খুন করেনি। ···হ্যাঁ।···না, না। প্লীজ মামুন, আজ নয়। তুমি কাল এসো। দেখা হলে সব বলবো।···হ্যাঁ। আচ্ছা ছাড়ি। খোদা হাফেজ।'

হাসি রিসিভার রেখে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রেহানা বললো, 'মাসুদকে ফোন করবো ?'

'করো। হাসি, তুই বললি—খারাপ খবর। সত্যি কি তাই ?' আনিস চৌধুরী ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

হাসি কোনো জবাব দিলো না। রেহানা কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মাসুদকে পেয়ে ফোনটা আনিস চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিলো। তিনি প্রথমে আস্তে বললেন, 'মাসুদ, কেমন আছিস ?' ভালো করে শোনা যাচ্ছিলো না বলে চিৎকার করে জানতে চাইলেন 'মাসুদ, ভালো আছিস তো ?···একটা খবর আছে।··· একটু জোরে বল্।···শুনতে পাচ্ছিস ?···এক ভূপদার্থবিদ এসেছিলেন—ডঃ কায়সার। তিনি নাকি সে রাতে জাফরকে

লিফট দিয়েছিলেন।···হ্যাঁ তার মানে তাই দাঁড়ায়।···তুই কি ছুটি পাবি? তোদের একবার আসা দরকার।···আসছিস তাহ'লে?···কি বললি?···'

আনিস চৌধুরী আচ্ছন্নের মতো রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কানে মাসুদের হাসি বাজছে। শৈশবে খেলতে খেলতে দুষ্টুমি করে সে এভাবে হাসতো। রেহানা কাছে এসে জানতে চাইলো, 'মাসুদ কি বললো?'

হাসিও জানালা থেকে সরে এসে দাঁড়ালো। আনিস চৌধুরী বললেন, 'মাসুদ ঠাট্টা করে বললো—তাই যদি হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ খুন করেছে। কে সে? জাফর যদি না হয়—তাহলে কে?'

দুই

কুঁচকে থাকা ডিভানের কভারটা টেনে সোজা করলো মণি। ছাইদানী থেকে সিগারেটের টুকরোগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো। ফরহাদ হুইল চেয়ারে বসে সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। স্ত্রীর এই অতি পরিপাটি থাকাটা তার খুব একটা পছন্দ নয়। কারণ মণির স্বভাবের এই দিকটি তার উপরও প্রভাব

ফেলে। বিয়ের কিছুদিন পর পোলিও হয়ে ফরহাদ হাঁটার ক্ষমতা হারায়। মণির ভালবাসা তার পর থেকে যেন আরো বেড়ে যায়। নিঃসন্তান মণি স্বামীকে সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নিলো। মণির এই ভালবাসা, এই মমতা ফরহাদের কাছে মাঝে মাঝে শৃঙ্খলের মতো মনে হয়।

'মন, তুমি এতো গোছালো স্বভাবের কেন?' মণি স্বামীর কথা শুনে একটু অবাক হলো।

'গুছিয়ে থাকাটা কি ভালো নয়? তুমি পছন্দ করো না?'

'করি,' ফরহাদের গলার স্বরে অবশ্য পছন্দ করাটা প্রকাশ পেলো না।

মণি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা কাগজ তুলে পড়তে লাগলো। ফরহাদ খুব ক্লান্তিবোধ করছিলো। স্বামীর জন্য কি করণীয় তাই দেখছে ও। এখনই হয়তো লেবুর সরবৎ কিম্বা দুধ নিয়ে আসবে।

'মন, তুমি জাফরের খবরটা এতো শান্তভাবে নিচ্ছো কি করে?'

মণি ফরহাদের পাশে একটা মোড়া নিয়ে বসে বললো, 'কি করার আছে?'

'তবু এটা একটা বড় খবর। উত্তেজিত হবার মতো খবর।'

আসলে আমার প্রথমে কিছুই মনে হয়নি। বাবা বললেন বলেই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হলো। হাসি বললে অবশ্য করতাম না। ও যা কল্পনাবিলাসী।'

'তুমি সবসময় হাসি সম্পর্কে এসব কথা বলো। আসলে ও

একেবারেই ছেলেমানুষ।' মণি কিছু বললো না। ডিভান থেকে একটা কুশন তুলে এনে ফরহাদের ঘাড়ের নিচে দিলো।

ফরহাদ এতো সেবাযত্ন পছন্দ করে না, কিন্তু কিছু বলেও না। মণি যা নিয়ে খুশি থাকে, থাকুক। সে বললো, 'মাসুদ ফোন করেছিলো না?'

'হ্যাঁ, ভোরে।'

'কি বললো।'

মণি বিরক্তির সাথে জবাব দিলো, 'কি জানি। ওকে আমি ভালো বুঝি না। খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। আমি ওদের মতো ভাবছি না বলে বকুনিও দিলো।'

'চিন্তিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'কেন?'

'ভাবো, মন। ভালো করে ভেবে দেখো।'

'আমার তো মনে হয় এটা খুব একটা বড় ব্যাপার না। কয়েকদিন লোকে একটু বলাবলি করবে তারপর ভুলে যাবে। বরং ভালোই হয়েছে একদিক থেকে। কে চায় পরিবারের কাউকে খুনী ভাবতে?'

'মন, লোকে শুধু বলে থেমে যাবে না। পুলিশও এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করবে।'

'কেন?'

ফরহাদ সস্নেহে বললো, 'বোকা মেয়ে! কেন, বুঝতে পারো না?'

মণি হঠাৎ দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো,

'দেখেছো, কথায় কথায় বেলা কতো হলো। তোমার স্যুপ বানাতে হবে।'

মণি উঠে দাঁড়াতেই ফরহাদ বললো, 'তাহ'লে আমরা কখন সূর্যমহলে যাচ্ছি ?'

'যাবো কি করে ? তোমার এই অবস্থা...'

এবার রেগে গেলো ফরহাদ, 'আমি ভালো আছি। শুধু আমার একটা অঙ্গ অচল। আসলে তুমিই যেতে চাও না।'

'হ্যাঁ, চাই না।'

'বোঝাতে চেষ্টা করলো ফরহাদ, 'বেশিদিন তো থাকবো না। তোমার বাবা যখন বলছেন তখন যাওয়া উচিত।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো মণি, 'ঠিক আছে। আমি যাই, তোমার স্যুপটা নিয়ে আসি। একটু শোবে তুমি ?'

'না। আচ্ছা মন, তুমি হাসপাতালের নার্স হলে না কেন ?'

আহত হলো মণি, 'আমি তো সবার সেবা করতে চাইনি। শুধু তোমার।'

আগ্রাবাদ হোটেলের একটা স্যুইটে বসে আনিস চৌধুরীর পরিবারের সবার কথা ভাবছিলেন ডঃ কায়সার। কেমন যেন অন্যরকম হলো ব্যাপারটা। কিন্তু কেন ? হতে পারে জাফর বখাটে, নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলে ছিলো। কিন্তু তবু তো ঐ পরিবারের একজন। তার কলঙ্ক তো পরিবারেরই কলঙ্ক। আর হাসি। তার শেষ কথার অর্থ কি ? 'সে তো বেঁচে নেই। বেঁচে আছি আমরা। আমরা যারা নির্দোষ।'

একটা সিগারেট ধরালেন ডঃ কায়সার। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কি সত্যি ওদের ক্ষতি করলেন ?'

ফোনটা বেজে উঠলো। তুললেন। রিসেপশন থেকে জানালো, জনৈক মিঃ চৌধুরী তাঁর সাথে দেখা করতে চান। পাঠিয়ে দিতে বললেন তিনি। কে চৌধুরী ? আনিস চৌধুরী নন তো ? হয়তো একা কোনো কথা বলতে বা জানতে চান···

দরজায় টোকা পড়লো। খুলে দিতেই ডঃ কায়সার একজন সুদর্শন তরুণের অসুখী মুখ দেখতে পেলেন। বয়স বছর পঁচিশেক হবে, এলোমেলো চুল, পোশাক ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে স্মার্টনেস প্রকাশ পাচ্ছে।

'আপনি ?'

'আমি আনিস চৌধুরীর ছেলে। আমার নাম মাসুদ চৌধুরী।'

'আসুন। কি করে জানলেন আমি এখানে আছি।'

মাসুদ ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো। 'আমি বসতে আসিনি। এসেছি আপনাকে দেখতে। আর আপনার মতো লোক যে আগ্রাবাদে উঠবে, সেটা কি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা ?'

'আমাকে দেখতে ? ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আপনি সেই বিখ্যাত ভূপদার্থবিদ ডঃ কায়সার ?'

'বিখ্যাত কিনা জানি না। তবে আমার নামই কায়সার।'

'আপনি দাবি করছেন যে জাফর খুন করেনি।'

'দাবি করছি না। কথাটা সত্যি। সে সময় জাফর আমার সাথে ছিলো।'

আচমকা প্রশ্ন করলো মাসুদ, 'আপনার বয়স কতো ?'

'আটত্রিশ।'

'আরো বেশি বলে মনে হয়।'

সামান্য কষ্ট পেলেন ডঃ কায়সার, 'হতে পারে।'

'আপনার কি কোন ভুল হতে পারে না?'

'আমার ভুল হয় নি।'

'কি করে জানলেন? ঘড়ি হয়তো স্লো ছিলো। অথবা জাফর আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। সে সব পারতো।'

'আমার ঘড়ি ঠিকই ছিলো। আমাকে সময় মেনে চলতে হয়। কিন্তু আপনি জাফরকে দোষী প্রমাণিত করার জন্য এতো ব্যস্ত কেন? যতো যাই হোক সে আপনার আপন ভাই; আপনার নিজের মাকে খুন করার জন্য অভিযুক্ত ..'

বাধা দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে বললো মাসুদ, 'কে বলেছে নিজের ভাই আর নিজের মা!'

'তার মানে?' বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন ডঃ কায়সার।

'জাফর কিংবা হাসি আমার কেউ নয়। রাহেলা চৌধুরীও আমার মা নন। কেন, কেউ বলেনি আপনাকে?'

'না।'

'রাহেলা বেগম বড় লোকের মেয়ে ছিলেন। বাবা মারা যাবার পর অঢেল সম্পত্তির মালিক হন। অসহায় শিশুদের জন্য একটা 'বেবী হোম' তৈরি করেন তিনি। একটু বড় হলে বাচ্চাদের কাউকে পালক হিসাবে দিয়ে দেন নিঃসন্তান দম্পত্তি, এতিমখানা ইত্যাদির কাছে। শুধু রেখে দিয়েছিলেন মণি, জাফর ও আমাকে। পরে যখন জানা গেলো তাঁর সন্তান ধারণের ক্ষমতা

নেই, তখন টিনা ও হাসিকেও তিনি নিয়ে এলেন। হাসির বাবা-মার খবর পাওয়া যায়নি। টিনার মা ছিলো উপজাতীয়, সাপের কামড়ে মারা যায় চৌধুরী দম্পত্তির চোখের সামনে। আমাদের বাবা-মা কারা আমরা জানি না।'

স্তম্ভিত ডঃ কায়সার কথা খুঁজে পেলেন না। মাসুদ চৌধুরী ব্যঙ্গ করে বললো, 'সুতরাং, রাহেলা চৌধুরী বা জাফর আমার যে কেউ হয় না, তা তো বুঝলেন। আর জাফর যে একটা বদমাশ ছিলো সেটাও সত্যি।'

'বদমাশ হতে পারে, কিন্তু কিন্তু খুনী নয়,' বললেন কায়সার।

দরজা খুলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো মাসুদ, 'বেশ। আপনি যখন জোর দিয়ে বলছেন, তখন মানলাম জাফর খুনী নয়। তাহলে আমাদের মধ্যে কে খুনী? ভেবেছেন এ কথাটা? ভাবুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনি আমাদের কতখানি উপকার করেছেন।'

চলে গেলো মাসুদ। ডঃ কায়সারকে সে ভাবতে বলে গেলো। একরাশ ভাবনা ঘিরে ধরলো ডঃ কায়সারকে।

মাহতাব সাহেবের চেম্বারে বসে তাঁরা কথা বলছিলেন। মাহতাব সাহেব ডঃ কায়সারকে ভালভাবে লক্ষ্য করলেন। কিছুটা বয়স্ক মনে হলেও, তাঁর খ্যাতি কিম্বা জ্ঞানের তুলনায় ওটা কিছু নয়। প্রথম দিনের মতো আজও তাঁকে অপরাধ বোধে ক্লান্ত মনে হলো।

'ওদের আচরণ আপনার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে, তাই

তো ?' চুরুট ধরালেন মাহতাব আহমেদ।

'হ্যাঁ। ভেবেছিলাম পুলিশকে একথা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কারণ এটা তাদেরই ভুল। অথচ হলো উল্টোটা। পুলিশ বিশ্বাস করলো, পরিবারের লোকেরা করলো না।'

'জাফর ছিলো আনিস চৌধুরীর পরিবারের ব্ল্যাকশিপ। আর হ্যাঁ, জানেন তো, ওরা সবাই পালক ছেলে-মেয়ে।'

'হ্যাঁ, মাসুদ চৌধুরীর কাছে শুনলাম।'

'মাসুদকে কোথায় পেলেন ?'

'ও হোটেল আগ্রাবাদে এসেছিলো। আনিস চৌধুরীর ছোট মেয়ে যা বলছিলো, মাসুদও তাই বললো, তবে ভিন্নভাবে।'

মাহতাব সাহেব সোজা হয়ে বসলেন, 'কি বলেছিলো হাসি ?' একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন ডঃ কায়সার, 'মেয়েটি বলেছিলো, সমস্যাটা মৃতকে নিয়ে নয়, জীবিতদের নিয়ে।'

মাহতাব সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁকে চিন্তিত দেখালো। ডঃ কায়সার আগের মতো অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'ভেবেছিলাম আমি একটা ঘটনার সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি। ভুল। শেষ করার বদলে শুরু করলাম। নতুন সমস্যা তৈরি করলাম।' একটু থেমে বললেন, 'মাহতাব সাহেব, আপনি কি মনে করেন ফ্রেশ ইনভেস্টিগেশন হবে ?'

'তাতো হবেই।'

ডঃ কায়সারকে খুব বিমর্ষ দেখালো। টেবিলের পেপারওয়েটটা নাড়তে থাকলেন। মাহতাব সাহেব আবার বললেন, 'তবে কাজটা পুলিশের জন্যে খুব সহজ হবে না। সময়ের ব্যবধানটা

একটা বড় বাধা।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ডঃ কায়সার।

'আপনার কি-ই বা করার ছিলো!'

'আচ্ছা, রাহেলা চৌধুরীর মৃত্যুতে কে লাভবান হবে?'

'আলাদা করে কেউ না। সব ছেলেমেয়ে সম্পত্তির সমান অংশ পাবে। সেজন্য একটা ট্রাস্ট করা আছে। আনিস চৌধুরী, মিসেস চৌধুরীর এক আত্মীয় মনসুর আহমেদ এবং আমি হলাম তাঁর ট্রাস্টি। খোদেজার জন্য কিছু টাকা, এমনকি রেহানার জন্যও কিছু আলাদা করে দেয়া আছে। জাফরের বিধবা স্ত্রী হয়তো তার অবর্তমানে সম্পত্তির অংশ পেতো, তবে সে তো বিয়ে করে ফেলেছে।'

'জাফরের স্ত্রী!' ভীষণভাবে অবাক হলেন ডঃ কায়সার, 'কেউ আমাকে বলেনি জাফর বিবাহিত ছিলো।'

'ওহ্-হো। এই দেখুন। আমি আপনাকে সেদিন একথা বলতে ভুলেই গেছি। আমার মনেই ছিলো না আপনি এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ খবরের কাগজে পড়েননি। এই বিয়ের খবর অবশ্য চৌধুরী পরিবারের কেউ জানতো না। জাফরের মৃত্যুর পর ওর স্ত্রী এসেছিলো। চৌধুরী তার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন। মেয়েটি চাটগাঁয় একটা ছোটখাটো চাকরি করে। আসলে মেয়েটি জাফর মারা যাবার কয়েক সপ্তাহ পরে বিয়ে করে ফেলায় ওর কথা মনে ছিলো না। ওর বর্তমান স্বামী একজন ইলেকট্রিশিয়ান। চাটগাঁতেই থাকে।'

'আমি মেয়েটির সাথে দেখা করতে চাই।'

'বেশ তো। আমি আপনাকে ঠিকানা দিচ্ছি।'

'আমাকে একটা কথা বলুন। রাহেলা চৌধুরী মারা যাবার রাতে বাড়িতে কে কে ছিলো?' ডঃ কায়সারকে চিন্তামগ্ন মনে হলো।

'আনিস চৌধুরী ছিলেন। সবার ছোট মেয়ে হাসি। মণি ও তার পঙ্গু স্বামী তখন বেড়াতে এসেছিলো। ফরহাদ আহমেদ মাত্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলো। খোদেজা খানম, নার্সারীতে যে মিসেস চৌধুরীকে সাহায্য করার জন্য যোগ দেয়। পরে ওঁদের সাথেই রয়ে গেছে। মহিলা হাসপাতালের নার্স ছিলো। মাসুদ ও টিনা অবশ্য ছিলো না। মাসুদ চাটগাঁর একটি মোটর ওয়ার্কশপে, আর টিনা চাটগাঁ শহরতলিতে একটি লাইব্রেরীতে কাজ করে। ওর কাছাকাছিই থাকে।'

একটু থেমে মাহতাব সাহেব আবার বললেন, 'রেহানা আখতার ছিলো চৌধুরী সাহেবের সেক্রেটারী। তবে মিসেস চৌধুকে যখন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তার আগেই সে বেরিয়ে যায়।'

'আমার সাথে দেখা হয়েছে। চৌধুরী সাহেবের খুব অনুগত মনে হলো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ চৌধুরী সাহেব বোধহয় মেয়েটিকে বিয়ে করবেন।

'ওহ্, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে ভদ্রলোক খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন।'

'ঠিকই তো।'

ডঃ কায়সার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'অর্থের দিক থেকে কারো তেমন কোনো মোটিভ থাকতে পারে না। কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রে? বলতে পারেন?'

'দুঃখিত। আমি এ পরিবারকে অতোটা ঘনিষ্ঠভাবে দেখিনি।'

ডঃ কায়সার অবশ্য দমলেন না। 'অন্য কারো নাম বলতে পারেন, যিনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?'

'তেমন কেউ...' মাহতাব সাহেব ভাবতে লাগলেন, 'আপনি বরং—কি যেন নাম—ডাঃ মাহবুবের সাথে দেখা করতে পারেন। অবসর নিয়েছেন ভদ্রলোক। স্থানীয় লোক। প্র্যাকটিসও এখন ছেড়ে দিয়েছেন। তবে চৌধুরী পরিবারকে ভালভাবে চেনেন। গিয়ে দেখুন উনি কিছু বলেন কিনা। আপনার অবশ্য সুবিধা আছে। পুলিশের কাছে লোকে সহজে মুখ খোলে না।'

'দেখি,' উঠলেন ডঃ কায়সার, 'আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, মিঃ মাহতাব।'

তিন

'আসতে পারি, স্যার?' হাসান আলী পুলিশ কমিশনারের অফিস কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন।

'আসুন। আমি আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।' কমিশনারকে চিন্তান্বিত দেখালো। তিনি হাসান আলীকে বসতে বললেন।

গোয়েন্দা বিভাগের সবচেয়ে কর্মঠ ও প্রতিভাবান অফিসার হাসান আলী। বয়সের তুলনায় সামান্য গম্ভীর। ভাবা-ই যায় না এই মানুষটা কখনো শিশুদের সাথে খেলেছেন বা বন্ধুদের ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে যোগ দিয়েছেন।

'বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, আমি রাহেলা হত্যা মামলার বিষয়ে কথা বলতে ডেকেছি।'

'জ্বি, স্যার। মনে হচ্ছে আমরা মস্ত এক ভুল করে ফেলেছিলাম।'

'ভদ্রলোক, কি যেন নাম—কায়সার, ডঃ কায়সার। আত্মভোলা বিজ্ঞানী। এঁরা প্রায় সময়ই-ঘটনা গুলিয়ে ফেলেন।'

'স্যার, ভদ্রলোক একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁকে বিশ্বাস করেছেন।'

'তার অর্থ : তদন্ত আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।'

'জ্বি, স্যার।'

'কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন?'

'জ্বি, স্যার।

'তাহলে আমরা গোড়া থেকে শুরু করছি।'

'জ্বি স্যার। আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হচ্ছে।'

হাতের কাগজ পত্রের দিকে তাকালেন না হাসান আলী। দু' বছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। ঘটনার বিবরণ তাঁর মনে

আছে।

'জাফর চৌধুরীকে কেমন মনে হয়েছিলো ?'

'বড় লোকের বখে যাওয়া ছেলে। মামলাটা তখন খুব সহজ মনে হয়েছিলো। ফোন এলো যে রাহেলা চৌধুরী খুন হয়েছেন। চৌধুরী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে জানা গিয়েছিলো, জাফর মিসেস চৌধুরীকে শাসিয়েছিলো। যে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মিসেস চৌধুরীকে খুন করা হয়েছে, তার উপর জাফরের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিলো। তাছাড়া জাফরকে গ্রেফতার করার পর তার পকেটে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিলো, তাতে মিসেস চৌধুরীর আঙুলের ছাপ ছিলো। সব মিলিয়ে…'

'না হাসান, এ ভুল আপনার একার নয়। আমরাও তখন নিশ্চিন্ত মনে জাফরকে খুনী ভেবেছিলাম, দুর্ভাগ্য আমাদের, জাফর চৌধুরী মারা গেছে।'

'হাসান আলী কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। স্বল্পভাষী হাসান আলীকে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি গম্ভীর মনে হলো।' কমিশনার টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, 'জাফর খুন করেনি। তাহলে কে করলো ? মহিলা নিজের মাথার পেছন দিকে ডাণ্ডার বাড়ি মারতে পারেন না। তবে কে একাজ করলো ?'

'এটা জানা দরকার।'

'আদৌ কি জানতে পারবো ?' পুলিশ কমিশনারের কণ্ঠ সামান্য হতাশ শোনালো।

হাসান আলী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'কেউ এক-

জন ঘরের কাছাকাছি ছিলো। জাফরের শাসানি শুনেছিলো। অথবা বাইরে থেকে কেউ এসেছিলো যাকে মিসেস চৌধুরী নিজে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। চৌধুরী পরিবার একটু সাবধানী। দরজা ভেতর থেকে ভালভাবে বন্ধ থাকে সবসময়।'

'কে খুন করলো এবং কেন?'

'এটাই খুঁজে বের করতে হবে। খুনের মোটিভ কি? ছেলে মেয়েরা স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে চৌধুরী দম্পত্তির কাছে। আশ্রয়, ভালো খাওয়া-পরা, স্নেহ-মমতা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ-সুবিধা। অবশ্য...'

'কি?'

'আনিস চৌধুরী রেহানাকে তখন থেকেই বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন কিনা জানি না। মেয়েটি চমৎকার। গ্ল্যামার নেই, অথচ স্নিগ্ধ। অবশ্য ওরকম কিছু থাকলে গুজব-টুজব অন্তত শোনা যেতো।'

'সে কথা ঠিক। এসব কথা বাতাসে ভেসে বেড়ায়।' সমর্থন করলেন কমিশনার।

'তাছাড়া খোদেজা খাতুনের কথা ধরা যায়। হয়তো বা খোদেজা খাতুনকে রাহেলা চৌধুরীর যতোটা অনুগত মনে হয়েছে, ততোটা সে ছিলো না। অবশ্য তার এ ক্ষেত্রে অর্থকরী কোনো লাভ নেই। তবু বলা যায় না।'

'হ্যাঁ, এসব ক্ষেত্রে কিছুই বলা যায় না। বাইরের কারো পক্ষে কি এ কাজ সম্ভব।

'মনে হয় না। অবশ্য এরকম একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা তাহলে কে?

হয়েছে। ড্রয়ার টেনে বের করা ছিলো যেখান থেকে টাকা খোয়া গেছে।'

'টাকার ব্যাপারটাই আশ্চর্য লাগছে!' চিন্তিতভাবে বললেন কমিশনার।

'হ্যাঁ। জাফরের কাছে পাওয়া একটি নোট ঐ ড্রয়ার থেকে নেয়া, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। নোটটির পেছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সই ছিলো। জাফর বলেছিলো, টাকাটা ওর মা ওকে দিয়েছেন।'

'কিন্তু রেহানা ও আনিস চৌধুরী জোর দিয়ে বলছেন যে পৌনে সাতটায় রাহেলা চৌধুরী এসে ঝগড়া ও শাসানোর কথা বলেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মিসেস চৌধুরী টাকা দেবেন না সেকথাও বলেছিলেন।' এক মুহূর্ত থামলেন কমিশনার, 'অবশ্য যদি না তাঁরা দু'জন…'

'মিথ্যা বলে থাকেন?' কথাটা শেষ করলেন হাসান আলী, 'হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ একজন এ ঝগড়াটা শুনতে পেয়ে ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে ছুটে গিয়ে জাফরকে দিয়ে বলে, ওর মা মত বদলেছেন। পরে মিসেস চৌধুরীকে এমন সাবধানতার সাথে খুন করে যাতে ডাণ্ডা থেকে জাফরের হাতের ছাপ মুছে না যায় আবার তার নিজেরটাও না পড়ে। এভাবেও ফাঁসানো যায়।' যেন নিজের উপরই ক্ষেপে গেলেন কমিশনার, 'কিন্তু কে? সে সময় আর কে ছিলো বাড়িতে? রেহানা, হাসি, আনিস চৌধুরী, খোদেজা।'

'বিবাহিতা বড় মেয়ে মণি স্বামীসহ তখন বাপের বাড়ি

এসেছিলো।'

'ভদ্রলোক তো পঙ্গু, না? তাকে বাদ দেয়া যাক। মেয়েটি কেমন?'

হাসান আলীর ভ্রূ কুঁচকে গেলো, 'খুব শীতল ধরনের। উত্তেজিত হয় না, উচ্ছ্বসিত হয় না। খুনী বলে ভাবা যায় না।'

'চাকর-বাকর?' জানতে চাইলেন কমিশনার।

'সবাই ঠিকা কাজ করে। সন্ধ্যা ছ'টায় সবাই যে যার বাড়ি চলে যায়।' হাসান আলী জানালেন।

'সময়টা মিলানো যাক। রাহেলা চৌধুরী পৌনে সাতটায় এসে জাফরের সাথে ঝগড়ার কথা জানান। তখন রেহানা উপস্থিত ছিলো। সাতটার ঠিক পর পর রেহানা বাড়ি চলে যায়। হাসি সাতটার দু'তিন মিনিট আগে তার মাকে জীবিত দেখে। তারপর থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কেউ তাঁকে দেখেনি। খোদেজা খাতুন প্রথম লাশ আবিষ্কার করে। আধ ঘন্টা যথেষ্ট সময়।' একটু থামলেন কমিশনার। তারপর হাসান আলীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই সময় রাহেলা চৌধুরীকে খুন করার সুযোগ অনেকেরই রয়েছে। হাসি খুন করতে পারে। রেহানা লাইব্রেরি ও বাড়ি ছাড়ার মধ্যেকার সময়ে খুন করতে পারে। খোদেজা খাতুন করতে পারে। আনিস চৌধুরী লাইব্রেরিতে একা ছিলেন সাতটা দশ থেকে খোদেজা চিৎকার না করা পর্যন্ত। এই বিশ মিনিটের মধ্যে যে কোনো সময় তিনি গিয়ে স্ত্রীকে খুন করে আসতে পারেন। মণি এই আধ ঘন্টার মধ্যে উপর তলা থেকে নেমে এসে খুন করে যেতে পারে। এমনকি

রাহেলা চৌধুরী নিজে দরজা খুলে কাউকে ঢুকতে দিতে পারেন। মনে পড়ে মিঃ চৌধুরী বলেছেন, তিনি কলিং বেল ও তার পর পর দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শোনেন। অবশ্য তিনি সময় সম্পর্কে নিশ্চিত নন।'

'জাফরকে দরজা খুলে ঢোকাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ও বাড়ির সবার কাছে বাইরের দরজার চাবি আছে।' হাসান আলী মন্তব্য করলেন।

'আর একটা ভাই আছে না?'

'হ্যাঁ। মাসুদ। চাটগাঁয় চাকরি করে।'

'জানা দরকার সে-সন্ধ্যায় মাসুদ কি করছিলো।'

'দু'বছর পর কি কেউ মনে করতে পারবে? তখন মাসুদ নিজে বলেছিলো সে যেখানে কাজ করে, অর্থাৎ মোটর ওয়ার্কশপের একটি সারিয়ে তোলা গাড়ি চালিয়ে টেস্ট করছিলো। কিন্তু ওর কাছেও তো চাবি আছে। খুন করাটা ওর পক্ষেও অসম্ভব নয়।'

কমিশনারকে আর একবার ক্রুদ্ধ দেখালো, 'আমরা কি কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো?'

হাসান আলীর চেহারায় একটা আবেগহীন দৃঢ়তা ফুটে উঠলো। তিনি অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে জানতে হবে কে খুন করেছে। আমি যতদূর জানি, রাহেলা চৌধুরী ছিলেন একজন অত্যন্ত ভালো মহিলা। তিনি দশজনের জন্য অনেক করেছেন। এইসব ভাগ্যহীন শিশুদের তিনি ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর খুন হবার কথা নয়। সবাই

হাল ছাড়লেও আমি ছাড়বো না। আমাকে জানতেই হবে।'

কমিশনার দাঁড়িয়ে হাসান আলীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'ওয়েল, আই উইশ ইউ দা বেস্ট অফ লাক। হতাশ হবেন না। আশা করি নিশ্চয় সফল হবেন।'

চার

ডঃ কায়সার হতশ্রী একতলা বাড়িটার জীর্ণ দরজার কড়া নাড়লেন। দরজা খুললো অতি সাদামাঠা এক তরুণী। জাফরের বিধবা স্ত্রী মরিয়ম এখন নুরুদ্দিন নামক ইলেকট্রিশিয়ানের ঘরনী। মহিলার বিস্মিত মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন ডঃ কায়সার। নাহ্ চৌধুরী দম্পতির পুত্রবধু হবার মতো কোনো যোগ্যতাই নেই তার।

'আমার নাম কায়সার। মাহতাব সাহেব বোধহয় আমার কথা চিঠি লিখে জানিয়েছেন।'

'ও, আপনিই? আসেন।' মেয়েটির কথায় আঞ্চলিক টান।

ছোট একটা ঘরে ঢুকে দাঁড়ালেন ডঃ কায়সার। অগোছালো, নোংরা, ময়লা কাপড় সরিয়ে বিছানাটা টেনে-টুনে বসতে দিলো মরিয়ম।

'আপনি তাহলে জাফরকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম ওটা জাফরের বানানো কথা।'

মেয়েটির কণ্ঠে যেন বিদ্রূপের আভাস পাওয়া গেলো। ডঃ কায়সারের শুদ্ধতাবাদী মন সামান্য আহত হলো।

'জাফর মিথ্যা বলেনি। আমি সত্যিই তাকে লিফ্‌ট দিয়েছিলাম।'

'দু'বছর আগের ঘটনা। কাল রাতে আমি ও আমার স্বামী কথা বলছিলাম। ডিটেকটিভ গল্পের মতো। বেচারা জাফর, ও যে নির্দোষ এটা এতদিন পর প্রমাণ হলো, জানতে পারলো না। ওর নিউমোনিয়া হয়েছিলো জানেন তো?'

ডঃ কায়সার মরিয়মকে দেখছেন। জাফর সম্পর্কে 'বেচারা' শব্দটা ব্যবহার করলেও দুঃখের কোনো লেশমাত্র তার মুখে খুঁজে পাওয়া গেলো না। জাফরকে হতভাগ্য ভাবলেন তিনি।

মরিয়মই আবার কথা বললো। মেয়েটি একটু প্রগল্‌ভ।

'তখন অবশ্য মনে হয়েছিলো মরে যাওয়াটাই ওর জন্য ভালো হয়েছে। বেঁচে থেকে জেলে পচে মরা...'

'সে তো নিশ্চয়। আপনি কি করতেন জাফর বেঁচে থাকলে?' বিতৃষ্ণার সাথে জানতে চাইলেন ডঃ কায়সার।

'আমার বর্তমান স্বামী তখনই বলেছিলো তালাক নিতে। সে অবশ্য আগেই বারণ করেছিলো জাফরকে বিয়ে করতে। দু'জনই আমাদের বাড়িতে আসতো।'

'আপনি তার কথা শোনেননি?'

'না, তখন আমার বয়স আরো কম ছিলো। বোকা ছিলাম।

তাছাড়া জাফর মেয়েদের পটাতে পারতো। কে জানে কেন। এমন নয় যে, ও দেখতে ভালো ছিলো। কিন্তু কেন যেন যে কোনো বয়সের মেয়েরা ওর প্রেমে পড়ে যেতো। আর ও সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়তো না।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। ও যে গ্যারেজে কাজ করতো, সেখানে কি একটা গোলমালে যেন জড়িয়ে পড়েছিলো একবার। ওকে থানায় দেবেন বলেছিলেন গ্যারেজের মালিক। জাফর তাঁর বউকে আগেই হাত করে রেখেছিলো। বয়স্কা মহিলা, জাফর যা বলতো তাই শুনতো। সে তার স্বামীকে বোঝালো যেন ওকে থানায় না দেয়া হয়। ক্ষতিপূরণের টাকা দিলেই যেন ছেড়ে দেয়া হয়। ঠিক তাই হলো। অথচ টাকাটা যে তাঁর স্ত্রীই জোগালো, একথা মালিক টেরও পেলেন না। এ ঘটনা নিয়ে পরে আমরা দু'জন অনেক হেসেছিলাম।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডঃ কায়সার। যতো দিন যাচ্ছে ততো জাফরের চরিত্রটা একটু একটু করে তাঁর কাছে উন্মোচিত হচ্ছে।

'মিসেস নুরুদ্দিন, আমি এসেছিলাম যদি আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি।'

'কেন আমরা তো ভালোই আছি। গতমাসেও দেশে খানিকটা ধানী জমি কিনেছে আমার স্বামী। অবশ্য আপনি যে আমাদের কথা ভেবেছেন এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'শুনে ভালো লাগলো যে, ঐ অশুভ ঘটনাটা আপনার

জীবনে কোনো স্থায়ী ছায়া ফেলেনি।'

'তখন অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম ছিলো। পাড়া-পড়শী নানা কথা বলছিলো। পুলিশ আসলো। রাস্তায় বেরোতে পারতাম না। নানান লোকে নানান কথা বলতো।

ডঃ কায়সার জাফরের বিবাহিতা স্ত্রীর চেহারায় কোথাও শোক বা দুঃখের ছায়া দেখতে পেলেন না। কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। তবু বললেন, 'আপনারা কি বিশ্বাস করেছিলেন জাফর খুন করেছে?'

'মানে—আসলে তখন তো তাই মনে হয়েছিলো। জাফর অবশ্য বলছিলো ও খুন করেনি। কিন্তু ওর কোন্ কথাটাই বা বিশ্বাস করা যেতো?'

'জাফর তো ওর বাড়িতে আপনাদের বিয়ের কথা বলেনি। আপনি ওদের কখনো দেখেননি?'

'না। ওরা বিরাট বড়লোক। আমি তো বলতে গেলে প্রায় বস্তিতেই মানুষ। জাফর বলছিলো ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখাই ভালো। ও বলতো মায়ের কথামতো চলতে চলতে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো।'

ডঃ কায়সারের নিষেধ সত্ত্বেও মরিয়ম এক কাপ চা ও কয়েকটা সস্তা বিস্কুট এনে সামনে রাখলো। কিছুক্ষণ পর আবার বললো, 'ভাবতে অবশ্য কেমন লাগে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো, জাফর ওর মাকে মারতে চায়নি। ও ভেবেছিলো অজ্ঞান করে টাকাটা নিয়ে আসবে। বাড়িটা একটু জোরে হয়ে গিয়েছিলো।'

'টাকার জন্য মায়ের মাথায় আঘাত দেয়াটা মেনে নিয়েছিলেন ?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, জাফরের ভীষণ টাকার দরকার ছিলো। নাহ'লে ওকে জেল খাটতে হতো ?'

'তাহলে আপনি জাফরকে দোষ দিচ্ছেন না ?' মরিয়া হয়ে বললেন ডঃ কায়সার। তিনি আসলে কি জানতে চান বুঝতে পারলো না মরিয়ম। বললো, 'দোষ যে একেবারে দিচ্ছি না তা নয়। আমি গরীবের মেয়ে। পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় আমার পরিবার কখনো যায়নি। তার উপর আবার খবরের কাগজে নাম ওঠা সে এক মহা ঝামেলা।'

'জাফর গ্রেফতার হবার পর আপনি কি করলেন ?'

'মা বললো ওর বাবার সাথে দেখা করতে। যতোই হোক, আমি ছিলাম জাফরের বিবাহিতা স্ত্রী। আমার প্রতি তো ওদের একটা কর্তব্য আছে।'

'আপনি গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। প্রথমেই দেখা হয়েছিলো ওদের ঐ—কি যেন নাম। ও হ্যাঁ, খোদেজা খাতুন, তার সাথে। সে তো বিশ্বাসই করে না যে আমি জাফরের বউ। বলে, হতেই পারে না। জাফর তোমাকে বিয়ে করতেই পারে না।' আমার খুব রাগ হয়েছিলো, আমি বলেছিলাম, 'শুধু বিয়ে নয়, লোকজন ডেকে রীতিমতো কাজী ঘরে এনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে। তবু সে বলে, আমি বিশ্বাস করি না।'

'তারপর ?'

'তারপর জাফরের বাবা এলেন। উনি অবশ্য খুবই ভালো লোক। বললেন জাফরকে বাঁচাবার সব চেষ্টা করবেন। আমাকে কিছু টাকা দিলেন। উনি সেই থেকে এখন পর্যন্ত মাসে মাসে আমাকে টাকা পাঠান। তাছাড়া আমার দ্বিতীয় বিয়ের সময়ও বেশ কিছু টাকার একটা চেক পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য আমার স্বামী চায় না যে, আমি ওই টাকা নিই। কিন্তু আমি তাকে বোঝাই, ওদের তো অনেক আছে। দিক না কিছু। ঠিক বলিনি?'

'নিশ্চয়।'

দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ। মরিয়ম উঠে খুলে দিলো। ঘরে যে ঢুকলো তার বয়স বছর পঁচিশেক হবে। চেহারায় একটা অমার্জিত ছাপ। মরিয়ম বললো, 'আমার স্বামী।' ডঃ কায়সার উঠে দাঁড়ালেন। মরিয়ম তাঁর পরিচয় দিতেই নুরুদ্দিনের কপালে অসন্তোষের রেখা ফুটে উঠলো। বললো, 'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ আছে? কিছু মনে করবেন না। মরিয়মের কপালটা খারাপ। জাফর যে ভালো ছেলে নয় আমি অবশ্য সেটা বরাবরই জানতাম।'

'হতে পারে। তবে ও খুনী নয়।' দৃঢ়তার সাথে বললেন ডঃ কায়সার।

'আপনি বলছেন অবশ্য।' অবিশ্বাসের স্বরে বললো নুরুদ্দিন।

'শুধু আমি বলছি না। প্রমাণও আছে। ও আমার গাড়িতে ছিলো।'

'মাহতাব সাহেব চিঠিতে সে কথা লিখেছেন। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, জাফর তো মরে গেছে। সবকিছু

চুকে-বুকে গেছিলো। আবার সব ঘাঁটাঘাঁটি করলে লোকে নানা কথা বলবে।'

'কিন্তু ন্যায়বিচার বলে একটা কথা আছে, নুরুদ্দিন সাহেব।'

'আমার তো বিচারবিভাগের উপর আস্থা আছে। ঠিকই বিচার করেছিলো তারা।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আদালতও ভুল করতে পারে। বিচারের ভার মানুষের হাতে। আর জানেন তো মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।'

ডঃ কায়সার পথে নেমে এলেন। তাঁকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রান্ত মনে হলো। মরিয়মের স্বামীর কথা-ই কি তিনি মেনে নেবেন, জাফর মারা গেছে। এমন বিচারকের কাছে পৌঁছে গেছে যার বিচারে কখনো ভুল হয় না। আর যে মৃত, সে সামান্য চোরই হোক আর খুনীই হোক, কি আসে যায়?

এক প্রচণ্ড রাগ আচমকা তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়লো। 'নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে যে জাফরের নাম থেকে মিথ্যে অপবাদ মুছে গেলে খুশি হবে।' মরিয়ম জাফরকে ভালবাসেনি, মোহগ্রস্ত ছিলো। কিন্তু ওর বাবা, যিনি ওকে মানুষ করেছেন তিনি। একবারও কি মৃত নিরপরাধ জাফরের কথা কেউ ভাববেনা?···থাকতেই হবে। নিশ্চয়ই কেউ একজন আছে। কিন্তু কে?

পাঁচ

লাইব্রেরী বন্ধ হলো ঠিক পাঁচটায়। মেয়েটি বেরিয়ে এলো। হালকা ছোটখাটো গড়ন, গায়ের রঙ কালো। ফিগারটা চমৎকার। আকাশী রঙের সুতী শাড়ি পরনে। ডঃ কায়সার লাইব্রেরিয়ানের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন, এই মেয়েটিই তাহলে সাপের বিষে নিহত উপজাতি দম্পতির তনয়া।

'আপনি মিস টিনা চৌধুরী? আমি ডঃ কায়সার।'

'হ্যাঁ, বাবা আপনার কথা লিখেছেন। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।' শান্ত স্বরে বললো টিনা।

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা কোনো রেস্তোরাঁয় বসেও আলাপ করতে পারি।'

'চলুন।'

'আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না। আপনাকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

একটু হেসে পা বাড়ালো টিনা চৌধুরী।

রেস্তোরাঁটি ছোট এবং নিরিবিলি। তবে খুব উঁচুদরের নয়

বলেই মনে হলো।

টিনা বিব্রতভাবে বললো, 'চা-টা হয়তো খুব ভালো হবে না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা বরং আসল কথা শুরু করি।'

টিনা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'আমি আপনাদের পরিবারের সবার সঙ্গেই দেখা করেছি। শুধু আপনি এবং আপনার বিবাহিতা বোন বাকি ছিলেন।' বললেন ডঃ কায়সার।

'সবার সঙ্গে দেখা করাটা কি জরুরী?' টিনার অনুত্তেজিত কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো যা ডঃ কায়সারকে অস্বস্তিতে ফেললো।

'আমি ব্যক্তিগতভাবে সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে চেয়েছি যে, আমি সময়মতো আপনার ভাইয়ের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছি।' টিনার মুখে কোনো ভাবান্তর না দেখে তিনি বললেন, 'আপনি কি জাফরকে পছন্দ করতেন?'

একমুহূর্ত সময় নিয়ে টিনা বললো, 'না। আমি তাকে অপছন্দ করতাম। অবিশ্বাসও করতাম। জাফর ছাড়া আর কেউ খুন করতে পারে এমন চিন্তা আমার মাথায় কখনো আসেনি।'

'আমার মনে হচ্ছে আমি নতুন এক ঝামেলায় জড়ালাম আপনাদের,' হতাশ শোনালো ডঃ কায়সারের কণ্ঠ।

'বাবা বললেন, নতুন করে তদন্ত হবে।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'কেন?'

টিনার প্রশ্নে বিস্মিত হলেন ডঃ কায়সার। একটু থেমে সে নিজেই আবার বললো, 'আপনার পক্ষে কি চুপ করে থাকা সম্ভব হতো?'

'আপনি ন্যায়বিচারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ন্যায়বিচারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। এখন মনে হচ্ছে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু আছে।'

'সেটা কি?'

'নির্দোষিতা।'

টিনা চৌধুরীর কালো চোখের দৃষ্টি যেন সুদূরে হারিয়ে গেলো। ডঃ কায়সার বললেন, 'কি ভাবছেন, মিস চৌধুরী?'

'ভাবছি ম্যাগনা কার্টা'র সেই ক'টা লাইন, টু নো ম্যান উইল উই রিফিউজ জাস্টিস।'

সময় মতোই ডাঃ মাহবুবের বাসায় পেঁছিলেন ডঃ কায়সার।

একজন তরুণ, সম্ভবত ডাক্তারের পুত্র, তাঁকে বাগানে নিয়ে গেলো। বৃদ্ধ ডাক্তার ঝাঁঝরি দিয়ে বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে সেটা রেখে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আসুন, আসুন।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'মোটেও না। অবসর নেবার পর থেকে বেকার জীবনই কাটাচ্ছি। বসুন।'

বাগানেই বেতের চেয়ার পাতা ছিলো। একজন ভৃত্য কিছু-

ক্ষণের মধ্যে চা ও নাস্তা দিয়ে গেলো। ডঃ কায়সার এই ফাঁকে ডাঃ মাহবুবের চেহারা খুঁটিয়ে দেখলেন। ঘন পাকা ভ্রূ, মুখে বলীরেখা। অমায়িক, বেশ বুদ্ধি রাখেন বোঝা যায়।

ডাঃ মাহবুবই প্রথমে কথাটা তুললেন, 'আপনাকে ব্যাপারটা বেশ ভাবনায় ফেলেছে দেখছি।'

'জ্বি। আমি ঠিক এরকমটি আশা করিনি।'

'কি আশা করেছিলেন?'

'ভেবেছিলাম আমাকে দোষারোপ করবে সবাই। আমার প্রতি ঘৃণা বা বিরাগ আশা করেছিলাম। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতাও।'

'কিন্তু ঘৃণা, বিরাগ বা কৃতজ্ঞতা কোনটাই দেখছেন না। তাই তো?'

স্বীকার করলেন ডঃ কায়সার। পরিবারের একজন সদস্যের নির্দোষিতার প্রমাণ রয়েছে তাঁর কাছে। অথচ কেউ তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়।

'আমার কাছে কেন এসেছেন?' জানতে চাইলেন ডাঃ মাহবুব।

'আমি ঐ পরিবার সম্পর্কে আরো জানতে চাই। পারিবারিক ডাক্তার হিসেবে আমাকে ওদের সম্পর্কে হয়তো কিছু বলতে পারবেন।'

'আপনি কতটুকু জানেন?'

'আমি শুধু এটুকু জানি, একজন নিঃস্বার্থ চমৎকার মহিলা তাঁর দত্তক সন্তানদের জন্য সবই করেছিলেন। এদেরই একজন ছিলো বখে যাওয়া, অথবা যাকে আমরা বলতে পারি 'প্রব্লেম

চাইল্ড'। এই দু'টি পরস্পরবিরোধী মানুষের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু মিসেস চৌধুরীর চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। যে কোনো হত্যাকাণ্ডের মূল সূত্র লুকানো থাকে নিহত ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যেই। কিন্তু সবাই হত্যাকারীর চরিত্রের খোঁজ নিতে ব্যাকুল থাকে।'

ডাঃ মাহবুব থামলেন। একটু ভেবে চিন্তিত মুখে বললেন, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন, মিসেস চৌধুরী এমন চরিত্রের মানুষ ছিলেন, যাঁর খুন হবার কথা নয়!'

'ঠিক তাই। অন্য সকলেও একথা ভাবছে।'

'নীতিগতভাবে অবশ্য তাই মনে হয়। কিন্তু একটা কথা তো জানেন, কারো জন্যে কিছু করলে তাকে আপনি শৃঙ্খলে আটকে ফেলেন। হয়তো বা আপনি তাকে পছন্দও করেন। কিন্তু সে কি করে? তার সচেতন মন বলে, আপনাকে তার পছন্দ করা উচিত, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অবচেতন মনে সে এসবের উল্টোটাও করতে পারে।'

ডাঃ মাহবুব বলে চললেন, 'আপনি মা বিড়ালকে দেখেছেন। মাতৃত্ব লাভের পর প্রথম সে তার সন্তানদের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। ঘেঁষতে গেলে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়। কিন্তু এই অবসেশন তার কেটে যায় কিছুদিন পর। তখন সে তার স্বাভাবিক জীবন শুরু করে। দরকার হলে সে তার সন্তানদের যে রক্ষা করবে না তা' নয়—'

'এরা কেউই মিসেস চৌধুরীর আপন সন্তান নয়,' বললেন ডঃ কায়সার।

'আমি সে কথাই বলতে চাইছি। মেয়েরা বিয়ে করে, মা হয়। সুখী ও সন্তুষ্ট হয়। কিছুদিন পরে আগের জীবনে ফিরে যায়। তার সন্তান হয় সে জীবনেরই অংশ। কিন্তু নিঃসন্তান রাহেলা চৌধুরীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিলো তীব্র। সে প্রবৃত্তি তিনি মেটালেন দত্তক নিয়ে। কিন্তু আর দশটি মেয়ের মতো তাঁর সন্তান ধারণের শারীরিক সন্তুষ্টি এলো না। তাই তাঁর অবসেশনও কাটলো না। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনায়, দিন ও রাত্রির সমগ্র মুহূর্ত জুড়ে রইলো সন্তানরা। নেপথ্যে রয়ে গেলেন স্বামী আনিস চৌধুরী। আর তাঁর এই অতি-যত্নই এই সব ছেলে-মেয়েগুলির ছিলো ভারি অপছন্দ।'

'মিসেস চৌধুরীর চিকিৎসা কি আপনি করতেন?'

'না। তবে স্থানীয় ডাক্তার হিসাবে ছেলে-মেয়েদের দেখার জন্য ঘন ঘন ডাক পড়তো। আমার চিকিৎসার পদ্ধতি রাহেলা চৌধুরীর পছন্দ ছিলো না। আমি বলতাম, গাছ থেকে কুল-বা জাম পেড়ে খেলে কোনো ক্ষতি নেই। সামান্য ঠাণ্ডা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। ৯৯ ডিগ্রী টেম্পারেচার কোনো বাচ্চার ক্ষতি করতে পারে না।'

হাসির রেখা দেখা গেলো ডাঃ মাহবুবের মুখে। বললেন, 'আর এক কাপ চা চলবে?' ডঃ কায়সার বারণ করলেন, 'না, ধন্যবাদ। আপনি বলুন।'

'আসলে রাহেলা চৌধুরী ছেলে-মেয়েদের সাধারণ পোশাক পরতে দেননি, সাধারণ খাবার খাওয়াননি। এখানকার আর দশটি সাধারণ শিশুর সঙ্গে মিশতে দেননি। অথচ এসব তাদের

কোনো উপকারে আসেনি। তাদের দরকার ছিলো কিছুটা অযত্ন আর অবহেলা।'

'জাফর সম্পর্কে বলুন।'

'জাফরের একার কথা অবশ্য আমি ভাবছিলাম না। জাফর বখাটে, দুর্বিনীত ছেলে। যে-কোনো পরিবেশে সে এরকম চরিত্রের ছেলে হয়েই গড়ে উঠতো।'

'খুনের জন্য জাফর গ্রেফতার হওয়াতে আপনি বিস্মিত হননি?'

'না, হয়েছিলাম। এমন নয় যে, জাফর বিবেকবান ছেলে। জাফরের চণ্ডাল রাগ ছিলো, সেটাও আমি জানতাম। ছোট-বেলায় সে খেলনা বা অন্য কিছু আদায়ের জন্যে সাথীদের ওপর বলপ্রয়োগও করেছে। জাফর এমন চরিত্রের ছেলে, যার রক্তে খুনের নেশা ছিলো। কিন্তু সে নিজে হাতে সেটা করতে চায় নি। বড় জোর অন্যকে প্ররোচিত করে থাকতে পারে।' ডঃ কায়সার অনেকটা আপনমনে বললেন, 'আমি ভাবিনি ব্যাপারটা এরকম হবে।'

শান্তভাবে মাথা নাড়লেন ডাঃ মাহবুব, 'হ্যাঁ। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এদেরই কেউ একজন অপরাধী।'

'আপনার সঙ্গে আমি এই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলতে চাইছিলাম। দেখে তো মনে হচ্ছে কারো কোনো মোটিভ নেই মিসেস চৌধুরীকে খুন করবার।'

'আপাতঃ দৃষ্টিতে অবশ্য তাই মনে হয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সবারই মোটিভ রয়েছে।'

'আপনার তাই ধারণা ?'

ডাঃ মাহবুব পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মনে করেন এ ব্যাপারটির ফয়সলা করার দায়িত্ব আপনার ?'

'আমি এ দায়িত্ব এড়াতে পারছি না।' অসহায়ের মতো বললেন ডঃ কায়সার।

সায় দিলেন ডাঃ মাহবুব, 'ঠিকই বলেছেন। আপনার জায়গায় আমি হলে আমিও বোধহয় এইরকমই ভাবতাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। রাহেলা চৌধুরী তাঁর কর্তৃত্বের আওতায় এদের সকলকে বন্দী রেখেছিলেন। তাঁর নির্ধারিত প্যাটার্ণ থেকে প্রত্যেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন এদের জীবন-যাত্রা, শিক্ষা-দীক্ষার ভালো ব্যবস্থা করতে। এবং তাঁর মনোনীত পেশায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে। তিনি এদের এমনভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, যেন এরা তাঁর আপন সন্তান।'

'কিন্তু তারা তা ছিলো না।'

'না। এবং এদের সকলেরই ভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি, অনুভূতি, আচরণ, প্রবণতা ও চাহিদা ছিলো।'

হাসি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো অভিনেত্রী হবে বলে। একটা বাজে লোকের প্রেমে পড়েছিলো সে। কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হয় এবং স্বীকার করতে হয় যে, তার মা-ই ঠিক। অথচ সে একথা মোটেই স্বীকার করতে চায়নি। মণির এই বিয়েতে রাহেলার মত ছিলো না। ফরহাদ সাহসী ও ভালো ছেলে হলেও বিষয়বুদ্ধি ছিলো না। তারপর পোলিওতে পঙ্গু হয়ে গেলে রাহেলা চেয়েছিলেন তাদের সূর্যমহলে এনে রাখতে। ফর-

হাদ রাজি থাকলেও মণি ছিলো না। তবে রাহেলা বেঁচে থাকলে তাকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হতো।

মাসুদ মোটর ওয়ার্কশপে কাজ নিয়েছে। তার বাবা মা তাকে ত্যাগ করেছিলো, এ ব্যাপারটা সে কোনদিনই ভুলতে পারেনি। আমার ধারণা সে তার পালক মাকে সবসময় ঘৃণা করেছে।

আর খোদেজা, যদিও রাহেলাই তাকে এনেছিলো, তবু সে রাহেলাকে পছন্দ করতো না। আনিস চৌধুরীকে ভক্তি করে, ছেলেমেয়েদের ভালবাসে। রাহেলার প্রতি তাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছে। সেটা অন্য কথা।

'আনিস চৌধুরী সম্পর্কে বলুন।'

'তিনি রেহানাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। ভাগ্যবান ভদ্রলোক। রেহানা চমৎকার মেয়ে। আনিসকে খুব ভালবাসে, বহুদিন থেকে। রাহেলার প্রতি তার মনোভাব সহজেই অনুমান করা যায়। রাহেলার মৃত্যুতে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেলো। তবে আনিস এমন মানুষ নন যে, স্ত্রীর বর্তমানে একই ছাদের নিচে বসে সেক্রেটারীর সঙ্গে প্রেম করবেন। আবার স্ত্রীকে ত্যাগ করার মতো মানুষও তিনি নন।'

'আমি তাঁদের দু'জনকেই দেখেছি। কথা বলেছি। আমার মনে হয় না, তাঁরা খুন-খারাপি করতে পারেন।'

'তবু ও বাড়িরই কেউ একজন করেছে।'

'কিন্তু কে?'

'হয়তো আমরা কখনোই জানবো না। এ রহস্য আমাদের

অজানাই থেকে যাবে। এবং এটা ওই পরিবারের সদস্যদের জন্য খুবই মর্মন্তুদ হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাঃ মাহবুব।

'যেমন হাসি বলেছে, 'যে চলে গেছে সে তো গেছেই। যারা বেঁচে আছে, যারা নির্দোষ'—আমি এখন এ কথার অর্থ বুঝতে পারছি।' বেদনাহত দেখালো ডঃ কায়সারকে। ডাঃ মাহবুব বললেন, 'একশো বছর আগের একটি মামলার কথা আমি জানি। এক ভদ্রলোক মারা গিয়েছিলেন বিষের প্রভাবে। তাঁর স্ত্রী, প্রেমিকা এবং চিকিৎসক ছিলেন সন্দেহের তালিকাভুক্ত। মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। জানা যায়নি এদের মধ্যে কে তাঁকে বিষ দিয়েছিলো, নাকি তিনি নিজেই বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন ডঃ কায়সার।

'তাঁর স্ত্রী তিনটি সন্তান নিয়ে একঘরে হয়ে বেঁচে রইলেন কোনমতে। প্রেমিকা মদ খেয়ে খেয়ে মরে গেলো। চিকিৎসক সামাজিক ও পেশাগতভাবে ধ্বংস হয়ে গেলেন। এদের তিনজনকেই সারাজীবন লোকে খুনী সন্দেহ করে গেলো।'

'অথচ খুন করেছিলো একজন।' অন্যমনস্কভাবে মন্তব্য করলেন ডঃ কায়সার। মাথা নাড়লেন ডাঃ মাহবুব, 'হ্যাঁ এবং অন্য দু'জন নির্দোষ ছিলেন। একজন খুন করে পার পেয়ে গেছে, অন্য দু'জন...'

বাধা দিয়ে ডঃ কায়সার দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এখানে সেটা ঘটতে দেয়া যায় না। কক্ষণো না!'

ছয়

আয়নায় মুখ দেখছিলো হাসি। অহঙ্কার ও আস্থাহীনতার রৌদ্র-ছায়া তার মুখে খেলা করছিলো। নানা ঢঙে চুল আঁচড়ে দেখছিলো সে। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে চিরুণিটা সশব্দে রাখতেই আয়নায় আর একটি ছায়া দেখে চমকে উঠলো।

'তুমি ভয় পেয়েছো, হাসি!' বললো খোদেজা। হাসি ঘুরে দাঁড়ালো, 'ভয়!'

'হ্যাঁ। আমাকে। তুমি ভাবছিলে, যদি তোমাকে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসি!'

'কি পাগলের মতো যা তা বকছো,' বিরক্ত অথচ সংশয়যুক্ত কণ্ঠে বললো হাসি।

'আমরা এখন সবাই সবাইকে ভয় পাচ্ছি।' জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো খোদেজা।

'কার মনে কি আছে কে বলতে পারে! ডঃ কায়সার কেন যে এলেন!'

'বুয়া, এমনও তো হতে পারে, কাজটা বাইরের কেউ করেছে,'

বললো হাসি।

'তোমার মা তাকে ঢুকতে দেবেন ?'

'মাকে তো তুমি চিনতে। কেউ যদি কোনো অসহায়, দুঃস্থ বাচ্চার কথা বলে সাহায্য চাইতে আসতো তাহলে মা তাকে ফেরাতেন না।'

'তা ঠিক। কিন্তু এটা ভাবা যায় না যে, তিনি চুপচাপ বসে থেকে লোকটিকে নিজের মাথায় আঘাত দেবার সুযোগ দেবেন। আমার মনে হয় কাজটা তোমার মায়ের বিশ্বস্ত কেউ-ই করেছে।'

'আমরা কেমন করে এভাবে একে অপরকে সন্দেহ করে একসঙ্গে বসবাস করবো ?' হাসির কণ্ঠে অসহায় বেদনার সুর।

'আমার কথা শোনো, হাসি। কোথাও চলে যাও।'

'তা কি করে সম্ভব ?'

'কেন সম্ভব নয় ? মামুনের জন্য ?'

হাসির মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেলো। সে খুব বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো, 'ডঃ কায়সার না এলেই ভালো ছিলো।'

'হ্যাঁ, ডঃ কায়সার না এলেই ভালো ছিলো।' পুনরাবৃত্তি করলো খোদেজা।'

•

টাইপ করা চিঠিগুলি গুছিয়ে আনিস চৌধুরীর সামনে রাখলো রেহানা। তিনি সবগুলিতে সই করে অবসন্নভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। রেহানা উঠে গিয়ে একটি ফাইলের মধ্যে চিঠি-

গুলি যত্ন করে রেখে আনিস চৌধুরীর কাছে এসে দাঁড়ালো, 'তোমার বাইরে যাবার কি হলো ?'

'বাইরে ?' মনে করতে পারলেন না আনিস চৌধুরী।

'হ্যাঁ, তোমার দিল্লী হয়ে লণ্ডন যাবার কথা ছিলো এ মাসেই। আর্কাইভের জন্য কি সব কাগজ-পত্র···'

'ও হো, মনে পড়েছে।'

'আমি কি টিকেট, ভিসার ব্যাপারে যোগাযোগ করবো ?'

আনিস চৌধুরী রেহানার চোখে চোখ রেখে বললেন, আমাকে তাড়াতে চাও ?'

রেহানা হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাকুলভাবে বললো, 'ওগো না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে কাছ ছাড়া করতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হয়, একটু ঘুরে এলে তোমার হয়তো ভালো হতো। এখন·· মানে···এই সময়···'রেহানা কি বলবে বুঝতে না পেরে থেমে গেলো।

আনিস চৌধুরী সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি এতো অস্থির হচ্ছো কেন, রেহানা। সত্যের মুখোমুখি তো আমাদের হতেই হবে।'

'ডঃ কায়সার না এলেই ভালো ছিলো। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

'যে অপরাধ জাফর করেনি তার জন্যে তাকে দায়ী হয়ে থাকতে দেয়াটা ঠিক নয়, রেহানা।'

'কিন্তু জাফর তো করতেও পারতো। খুব বদমেজাজী ছিলো, তাই না ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে সবসময় তার চেয়ে দুর্বলদেরই আক্রমণ করেছে। আমার মনে হয় না রাহেলাকে আক্রমণ করার সাহস তার ছিলো। সে রাহেলাকে ভয় করতো। রাহেলা যে কর্তৃত্বপরায়ণ ও রাশভারী ছিলেন, সে তো তোমার অজানা নয়।'

রেহানা উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালো। কথাটা মিথ্যা নয়। কর্তৃত্ব জিনিসটা রাহেলা চৌধুরীর মজ্জাগত ছিলো। ঠিক যেন রাণী মৌমাছি। সবাইকে দাপটে রাখতেন। যেন সবসময় নির্ভুল ছিলেন তিনি, সবচেয়ে বেশি জানতেন এবং সঠিক পথটা চিনতেন।

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো রেহানা।

'আমরা কি এক্ষুণি বিয়ে করে ফেলতে পারি না?' ব্যাকুল শোনালো তার কণ্ঠ।

যথারীতি শান্তভাবে মাথা নাড়লেনআনিস চৌধুরী, 'তা হয় না, রেহানা।'

দ্রুতপায়ে কাছে এসে আবার হাঁটু গেড়ে বসে রেহানা ভীরু কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'তুমি কি আর আমাকে আগের মতো ভালবাসো না?'

'বাসি, রেহানা, বাসি। তুমিই আমার পৃথিবী। তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।'

দরজায় টোকা পড়লো। চা ও বিস্কুট ট্রেতে করে নিয়ে খোদেজা ঢুকলো।

'রেহানা, তোমার চা-ও কি এখানে এনে দেবো?'

'না, আমি নিচে যাচ্ছি।' রেহানা ধীর ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে গেলো। খোদেজা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি রেহানাকে কি বলেছেন?'

'কিছু না।'

খোদেজা আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলো। আনিস চৌধুরী চায়ের কাপটা সামনের টেবিলে রাখলেন। কিন্তু চুমুক দিলেন না। তাঁর দৃষ্টি সুদূরে। যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন অতীতের স্মৃতির স্তূপ।

রাহেলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় সমাজ সেবা করতে গিয়ে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্মঠ মেয়েটি তাঁর দৃষ্টি কেড়েছিলো। রাহেলা সবসময় দুঃস্থ-দরিদ্রের জন্য কিছু করার কথা ভাবতেন। মোটামুটি সুশ্রী, শক্ত-সমর্থ দোহারা গড়নের মেয়ে রাহেলাকে তাঁর মানবিক গুণে গুণান্বিতা দয়ালু এবং অনন্যা মনে হয়েছিলো। রাহেলার মতো তিনিও তখন অপরের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য প্রাণপণ করেছিলেন। ফলে প্রেম হলো দ্রুত। ধনীর দুলালী রাহেলা ও তিনি পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার স্বপ্ন দেখেন। রাহেলার হৃদয়ে উষ্ণতা ছিলো। কিন্তু বিয়ের পর তিনি বুঝতে পারলেন, রাহেলা তাঁকে ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু তার হৃদয়ের উষ্ণতা পরিণত হয়েছে তীব্র সন্তান কামনায়, যে সন্তান তাঁরা পাননি।

ডাক্তার দেখলেন। নামকরা, নামহীন, কবিরাজ, বদ্যি, হোমিওপ্যাথ। কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত রাহেলা

মেনে নিতে বাধ্য হলেন, তাঁর নিজের সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই। আনিস চৌধুরী রাহেলার জন্য মমতা অনুভব করেছিলেন। তাই রাহেলা যখন দত্তক নিতে চাইলেন, বাধা দেননি।

প্রথমে তাঁরা মণিকে পেয়েছিলেন। বাপ-মা হারা মেয়েটির দরিদ্র কাকা-কাকীর সংসারে অনাদরে, অবহেলায় কোনরকমে জীবন কাটছিলো। তাঁদের গাড়ির সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লাগায় মেয়েটির ভাগ্য ফিরে গেলো। তার কাকা-কাকীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মণি খুব সহজে এই নতুন প্রাচুর্যময় জীবন মেনে নিয়েছিলো। শান্ত মেয়ে। কিন্তু আনিস চৌধুরী একটা ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করেছেন, মেয়েটির পুরনো জীবনের প্রতি কোনো পিছুটান ছিলো না। তার চরিত্র অনেকটা পানির মতো, যে পাত্রে রাখা যায়, তারই আকার ধারণ করে। ভেবেছিলেন, ওর মধ্যে স্নেহ-মমতার ইঙ্গিত দেখা যাবে পরে। কিন্তু না। তার প্রতি যা যা করা হয়েছে সে তা সহজ, স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছে। কৃতজ্ঞ বোধ করেছে। কিন্তু মাতৃস্নেহে যিনি তাকে আপন করেছেন, তাঁর প্রতি কোনো ভালবাসা তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। এক সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি রাহেলা। 'বেবী হোম' তৈরি করলেন কিছুদিনের মধ্যেই। এতিমখানায় সময় সময় সাহায্য করেছেন। এধরনের নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। আর আনিস চৌধুরী নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। রাহেলার কর্মব্যস্ত গতিময় জীবন থেকে নেপথ্যে সরে গেলেন, তাঁর লাইব্রেরীতে, লেখাপড়ার মাঝে। কিছু কিছু গবেষণার কাজও শুরু করলেন। রাহেলা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন।

তিনি তাঁকে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে রাহেলা নিজের সম্পর্কে আরো বেশি নিশ্চিত হলেন। কর্তৃত্বভার হাতে নিলেন। আনিস চৌধুরী বুঝলেন, তাঁর সাহায্য বা ভালবাসার প্রয়োজন আর রাহেলার জীবনে নেই। তিনি ব্যস্ত, সুখী, এনার্জেটিক।

'বেবী হোম' করলেন রাহেলা। বাচ্চাদের জন্যে সবরকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করলেন। তাদের আরাম-আয়েস দিলেন। আনিস চৌধুরী বুঝিয়েছিলেন, এতো বেশি করাটা ঠিক নয়। এরা আবার আপন পরিবেশে, স্বজনদের কাছে ফিরে যাবে। রাহেলা সে কথায় কান দিতেন না। বলতেন, সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

খোদেজা এলো রাহেলাকে সাহায্য করতে। সেই থেকে সে নিঃস্বার্থ আনুগত্যে এই পরিবারের সঙ্গে রয়ে গেছে। রাহেলাকে প্রথম বিস্মিত করেছিলো মাসুদ। সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, ছেলেটির কোনো রোগ নেই। তবে হয়তো বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। রাহেলা এ কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, 'অসম্ভব! সেই নরকের জন্য ওর মন কেমন করতেই পারে না।'

মাসুদ রাহেলার স্নেহস্পর্শ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলো, 'আমি বাড়ি যাবো। মার কাছে যাবো। মণ্টুর কাছে যাবো।'

রাহেলাকে বোঝানো যায়নি, মাসুদের মা তাকে বিক্রি করে দিলেও মাসুদ তাকেই ভালবাসে।

বেচারী রাহেলা! অর্থ দিয়ে ভালবাসা কিনতে চেয়েছিলেন। প্রতি রাতে মাসুদ তার বস্তির ঘর আর বেধড়ক পেটাতো যে মা তার জন্য কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। তবু মাসুদকে রাহেলা ছাড়েননি, আপন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মণি তো আগেই ছিলো। টিনা এলো, শান্তশিষ্ট কালো লক্ষ্মী মেয়েটি। এক নারীর অবৈধ সন্তান হাসি, যাকে ফেলে তার মা নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছিলো। এবং জাফর! যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামীর সন্তান। জাফরের মা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিলো। জাফর-চঞ্চল, দুষ্টু ছেলেটা। যে শাস্তি পেয়েও ভয় পেতো না। মার খেয়েও দাঁত বের করে হাসতো। সে খোদেজার মতো কঠোর নিয়মের মানুষকেও হাত করেছিলো।

জাফরের স্কুল-রেকর্ড ভালো ছিলো। কলেজ থেকে সে হয়েছিলো বহিষ্কৃত। বার বার সে নতুন ঝামেলায় জড়িয়েছে। বার বার চৌধুরী পরিবার তাকে উদ্ধার করেছেন। তাঁদের ভালবাসার বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে তাকে শোধরাতে চেয়েছেন। কোনো লাভ হয়নি। জাফর যা চেয়েছে, তা দখল করেছে—বৈধ বা অবৈধ উপায়ে। কিন্তু খুব বেশি বুদ্ধি তার ছিলো না। তাই বার বার সে ধরা পড়েছে। শেষ দিনও এমন ভাবেই সে এসেছিলো, বিপদগ্রস্ত, জেলে যাবার ভয়ে ভীত। রাহেলার কাছে টাকার দাবী করেছিলো। না পেয়ে শাসিয়ে গিয়েছিলো, 'ভালোয় ভালোয় টাকা দিও। নইলে···'

ফলে রাহেলাকে জীবন দিতে হলো। জাফরও নেই। আর এখন···।

রাহেলা মানব চরিত্র বোঝেন নি। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেননি, কেস হিসেবে, সমস্যা হিসেবে বিচার করেছেন। তিনি কখনো বুঝতে চাননি প্রতিটি মানুষ ভিন্ন। তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ধরনের। তাদের মেজাজ-মর্জিতে ভিন্নতা থাকে। আনিস চৌধুরী রাহেলাকে বলতেন, কারো কাছ থেকে বেশি আশা না করতে। রাহেলা তাঁর কথায় কান দেননি।

অতীত। সে কতো দূরে! রেহানার কথা ভাবলেন তিনি। দক্ষ ও কর্মঠ, সেক্রেটারী। তাঁর ডান হাত। রেহানাকে দেখলে প্রথম যৌবনের রাহেলাকে মনে পড়ে যেতো। রাহেলার মতোই উষ্ণতা, আগ্রহ ও উদ্যম লক্ষ্য করেছেন তিনি মেয়েটির মধ্যে। পার্থক্য শুধু এই—রেহানার অন্তরের সবটুকু তাঁর উষ্ণতা জন্যে। একমাত্র ও একান্তভাবে শুধু তাঁরই জন্যে। প্রথমে তিনি টের পাননি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন রেহানাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন।

রাহেলা বেঁচে থাকলে অবশ্য রেহানাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারতেন না।

আনিস চৌধুরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চা জুড়িয়ে সরবৎ হয়ে গেছে। অন্যমনস্ক আনিস চৌধুরী সেই ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিলেন।

সাত

ডঃ কায়সার চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই তরুণ ডাক্তার মামুন হায়দারকে দেখা গেলো ডাঃ মাহবুবের দরজায়।

'আরে মামুন, এসো এসো।' অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আহ্বান জানালেন ডাঃ মাহবুব।

মামুন হাসতে চাইলো। কিন্তু তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে হাসিটা তেমন ফুটলো না। ডাঃ মাহবুব বললেন, 'অন্ধকার হয়ে আসছে। ঘরে গিয়ে বসি, চলো।' তাঁরা দু'জন ড্রইংরুমের সোফায় বসলেন। মামুন জানালো যে চা বা কফির ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই। ডাঃ মাহবুব এই তরুণটিকে বেশ স্নেহ করেন। পেশাগত মতদ্বৈধতা এবং বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা সুন্দর বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রয়েছে।

'কি ব্যাপার, মামুন?'

'আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।'

'খুলে বলো।'

'আসলে আমার কারো সঙ্গে কথা বলাটা খুব দরকার ছিলো। এটা তো গোপন কোনো ব্যাপার নয়। মানে···ইয়ে

…আমি আর হাসি…' সামান্য বিব্রত দেখালো মামুনকে।

হাসলেন ডাঃ মাহবুব, 'দু'জনের মধ্যে ভাব-সাব, আমাদের কালে বলতো।'

'আমাদের বিয়ের কথাও পাকাপাকি। কিন্তু এখন যা ঘটছে, তাতে ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে গেলো।'

'জাফরের দণ্ড মওকুফ, যা এলো অনেক দেরি করে। এটাই কি তোমাকে ভাবাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, এ ঘটনাটা না ঘটলেই ভালো হতো।'

'একথা অনেকেই ভাবছে। এমনকি ডঃ কায়সারও। আজ বিকালে এসেছিলেন।'

চমকে গেলো মামুন, 'তিনি কিছু বললেন, কে করেছে?'

'না, তিনি কি করে বলবেন। তিনি তো একেবারে বাইরের লোক একজন। ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন।'

'হাসিকে খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন, এমন কি ভীত মনে হলো।'

'ও খুব আবেগপ্রবণ। মেয়েটার বয়স তো বিশের কোঠা পেরোয়নি।' সান্ত্বনা দিলেন ডাঃ মাহবুব।

'কিন্তু সে এতো ভয় পাচ্ছে কেন?'

'তোমার কি ধারণা?'

অস্থির ব্যাকুলতা নিয়ে মামুন বললো, 'আমি ডাক্তার না হলে হয়তো এটা নিয়ে এতো ভাবতাম না।'

মামুনের কাঁধে হাত রাখলেন ডাঃ মাহবুব, 'মামুন, এসব ভেবো না।'

'কিন্তু হাসি। সে তো ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে এক

সময়। মায়ের শাসনের আওতা থেকে পালাতে চেয়েছে। বাজে লোকের প্রেমে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখেছে তার মা যা যা বলেছেন, সব ঠিক। হাসি অভিনেত্রী হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীর, তাছাড়া ঐ লোকটি হাসির উপযুক্ত ছিলো না।'

'এবং হাসি এ সত্য মেনে নিতে চায়নি। তাই তো?'

'হ্যাঁ। হাসি ঠেকে শিখেছে এবং সেটা সে মোটেই পছন্দ করেনি। অল্প বয়সে যা হয়।'

মামুন চুপ করে গেলো। যেন সে শক্তি সঞ্চয় করছে। ডাঃ মাহবুবের বয়সী মুখে চিন্তার ছাপ পড়লো, 'মামুন, তুমি কি ভাবছো, বলি? তোমার ধারণা রাহেলা চৌধুরী ও জাফরের ঝগড়া হাসি অলক্ষ্যে শুনতে পায়। এবং এই সুযোগে সে তার মায়ের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে।'

'না, ঠিক তা নয়। আমি এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে চাই না। তবে এরকমটি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। হাসি খুব মেজাজী মেয়ে। তাছাড়া···মানে, আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ডাঃ মাহবুব কোনো কথা বললেন না। মামুন আবার বললো, 'আমি হাসিকে দোষ দিই না। ও ছেলেমানুষ। নিজের ওপর কন্ট্রোল নেই। আবেগাক্রান্ত হয়ে, কর্তৃত্ব আর শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্যেও সে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।'

'হ্যাঁ, এটা হাসির মোটিভ হতে পারে। তবে একা শুধু হাসির নয়। রাহেলার মৃত্যুতে অনেকেরই লাভ হতে পারে।

আনিস চৌধুরী রেহানাকে বিয়ে করতে পারেন। মণি তার স্বামীকে নিয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে। মাসুদও তার পছন্দসই জীবনযাত্রা বেছে নিতে পারে। এমন কি কৃষ্ণ-কলি টিনাও কোনো না কোনো ভাবে লাভবান হতে পারে। এছাড়া অর্থকরী দিকটাও দেখা যায়। অন্যতম ট্রাস্টি হিসেবে রাহেলা অর্থের ব্যাপারটা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সবাই মুক্ত হয়ে গেলো।'

'আপনি তাহ'লে মনে করেন হাসি এ কাজ করতে পারে?'

'করতে পারে। কিন্তু করেছে কিনা আমরা জানি না।'

'আমি জানতে চাই। নিশ্চিতভাবে জানতে চাই। হাসি যদি আমার কাছে সব স্বীকার করে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আমরা বিয়ে করে ফেলতে পারি।'

'পুলিশকে কিছু না জানিয়ে?'

'আমি আইনের বাধ্য। কিন্তু আপনি তো জানেন মানসিক-ভাবে যারা বিপর্যস্ত তাদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করা হয় না। এটাকে আমরা এখন দুঃখজনক দুর্ঘটনা বলতে পারি।'

'মামুন, তুমি কি হাসিকে ভালবাসো?'

'বিশ্বাস করুন, পাগলের মতো ভালবাসি। সেজন্যেই পরি-ষ্কার জানতে চাই। সারাটা জীবন না জেনে থাকবো কি করে?'

'তার মানে এই যে, নিশ্চিত না জেনে তুমি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নও?' জানতে চাইলেন ডাঃ মাহবুব।

'আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মামুন।

'আমি জানি না। হয়তো, আমি যাকে ভালবাসি, তার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ থাকতাম।'

মামুন কোনো কথা বললো না। ডাঃ মাহবুবই আবার বললেন, 'তুমি ভাবছো, জানাটা খুব জরুরী। আচ্ছা, হাসি অপরাধী জেনেও তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে?'

'হ্যাঁ।' মামুন হায়দার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো।

'না মামুন। তুমি যা ভাবছো তা ঠিক নয়। যখনই কিছু খেতে গিয়ে বিস্বাদ ঠেকবে, তুমি ভাববে তাতে কিছু মেশানো হয়েছে। মোটা লাঠি দেখলে চমকে যাবে আত্মা। আর হাসি! সারা জীবন সে-ও তোমার কাছে কখনো সহজ হতে পারবে না। না মামুন, তুমি যা ভাবছো, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।'

'আপনি এসেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ, মাহতাব সাহেব।'

'আপনি না ডাকলেও আমাকে আসতে হতো। আজকের কাগজগুলো দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। সব ক'টি কাগজই এই কেসের কথা লিখেছে। আমরা কিছু ফোনও পেয়েছি রিপোর্টারদের কাছ থেকে।' জানালেন আনিস চৌধুরী।

ঝানু আইনজ্ঞ মাহতাব সাহেব বললেন, 'আমার পরামর্শ, আপনারা এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন না, কোনো মন্তব্য নয়। বলবেন, স্বভাবতই জাফরের নির্দোষিতা প্রমাণ হওয়াটা আপনাদের জন্য আনন্দের বিষয়। তবে আপনারা এ বিষয়ে কোনো আলো-

চনা করতে চান না।'

চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের মুখোমুখি বসে মাহতাব সাহেব তাঁর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে এদের বিচার করার চেষ্টা করলেন।

মণি চৌধুরী। সুন্দরী। সামান্য স্থূলবুদ্ধি। কোনো ব্যাপারে চিন্তিত হয় না। উদ্বেগে আক্রান্ত হয় না। কোনো ঘটনায় মুখে বিকারের চিহ্ন ফোটে না। তবে তাকে যতোটা শান্ত মনে হয়, ভেতরে ভেতরে কি সত্যিই ততোটা শান্ত? মণি তার অভিব্যক্তি অথবা অনুভূতিকে চেপে রাখতে জানে।

ফরহাদ খান। হুইল চেয়ারে বসে আছে। বুদ্ধিমান। চোখে সতর্কদৃষ্টি। চিন্তাচ্ছন্ন। বিষয়টি তার স্ত্রী যতোটা হালকা ভাবে নিয়েছে, সে ততোটা নেয়নি। মণি যেভাবে ফরহাদের দিকে তাকাচ্ছিলো, তাতে মাহতাব সাহেব অস্বস্তি বোধ করলেন। মণির মতো আবেগহীন মেয়ের দৃষ্টির এই তীব্র প্রেম ও আনুগত্য তাঁকে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরহাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভীতও করে তুললো।

মাসুদ চৌধুরী। সুদর্শন অথচ অসুখী। জীবনের প্রতি এক তিক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আছে ছেলেটির। কিন্তু কেন?

টিনা চৌধুরী। কালো হলেও লাবণ্যময়ী। অনায়াসে কৃষ্ণকলি নাম হতে পারে। আত্মকেন্দ্রিক। সেদিন অবশ্য এখানে ছিলো না। কিন্তু কর্মস্থল তো খুব দূরে নয়। মাসুদের সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

খোদেজা খাতুন। সন্দেহভাজনের তালিকায় সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যক্তি। পরিবারের কেউ নয়। এমনও তো হতে পারে

সে গিয়ে মিসেস চৌধুরীর মাথায় আঘাত করে। কিন্তু খোদেজা তো আবার ছেলে-মেয়েগুলোকে খুব ভালবাসে। জাফরকে ফাঁসাবার চেষ্টা কি সে করবে? মনে হয় না। বিশেষ করে জাফরের প্রতিই নাকি তার টান ছিলো বেশি।

আনিস চৌধুরী ও রেহানা। এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কথা সর্বজনবিদিত। স্থানীয় লোকজন যেমন জানে; তেমনি পুলিশেরও অজানা নয়। নারীঘটিত ব্যাপারে স্ত্রীকে খুন করার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু আনিস চৌধুরীর মতো মানুষ কি এ কাজ করতে পারেন? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। রেহানাকে মাহতাব সাহেব খুব বেশি চেনেন না। মেয়েটি সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। মেয়েরা আবার প্রেমে পড়লে বেপরোয়া কিম্বা মরিয়া হয়ে ওঠে। আর জাফরকে তার পক্ষে ফাঁসানো সম্ভব। জাফর অনেক মেয়েকে পটাতে পারলেও রেহানা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। না, রেহানাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না। এমন হতে পারে, রেহানা আনিস চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাহেলার ঘরে ঢোকে। আঘাত খেয়ে রাহেলা অচেতন হয়ে পড়ে গেলে দরজা খুলে বেরিয়ে বাড়ি চলে যায়। কেউ কিছু জানতে পারেনি।

হাসিকেও কি বাদ দেয়া যায়? না। মেয়েটি সুশ্রী। বলা যায় চেহারায় একটা অদ্ভুত লাবণ্যতা রয়েছে। তবে কিছুটা বন্যতাও আছে। হাসির পক্ষে মরিয়া হয়ে কিছু করাটা অস্বাভাবিক নয়। অতীতেও সে এরকম করেছে।

মাহতাব সাহেব ভাবলেন, ব্যাপার খুবই ঘোরালো। পুলিশ জানে না দোষী কে। চৌধুরী পরিবারও জানে না। অবশ্য একজন ছাড়া! অন্যরা এতদিন এ নিয়ে ভাবেনি। এখন ভাববে। সন্দেহ করবে একে অপরকে। এক অস্বস্তিকর পরিবেশে তারা বসবাস করবে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মাহতাব সাহেব কথা শুরু করলেন, 'পুলিশ আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করবে। তবে দু'বছর আগের ঘটনা সবার ঠিক মনে আছে কিনা কে জানে!'

'দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। তবে বাবা কলিং বেলের শব্দ শুনেছিলেন। তাই না, বাবা?' জিজ্ঞেস করলো মণি।

'হ্যাঁ। ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ছে না। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, আমি খুলতে যাবো ভেবে উঠেও দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ শুনি।'

'হুঁ।' চিন্তান্বিত দেখালো মাহতাব সাহেবকে।

'আপনার কি রায়, মাহতাব সাহেব?' মাসুদের কণ্ঠে ঠাট্টার সুর।

'আমার তো মনে হয় বাইরের কেউ বিপদের কথা বলে ঢোকে। এবং এ কাজটি তারই।'

'তাহলে এ গল্পই আমরা সবাই মিলে পুলিশকে বলবো?' মাসুদ হেসে উঠলো।

'আমার পরামর্শ তাই।' গম্ভীরভাবে বললেন মাহতাব সাহেব।

'হ্যাঁ, বুঝলাম, আপনার পরামর্শ। কিন্তু আপনার বিশ্বাসও

কি তাই ?'

মাহতাব সাহেব বিরক্ত হলেন। মাসুদকে নিয়ে এটাই বিপদ। যা না বলা শ্রেয়, সেটাই সেব লে বসে।

মাসুদ অন্য সবার দিকে তাকালো, 'সবাই কি এই গল্প বিশ্বাস করছো ? টিনা, বরাবর লক্ষ্মী বিড়ালটির মতো গুটিয়ে বসে আছো। মনের মধ্যে কি খেলা করছে ? মণি ?'

'আমি মাহতাব সাহেবের সঙ্গে একমত। এ ছাড়া আর কি ঘটতে পারে ?' মণি তীক্ষ্ণস্বরে বললো।

'ফরহাদ কিন্তু তা মনে করে না,' মাসুদ বললো। মণি চকিতে স্বামীর দিকে তাকালো। ফরহাদ শান্তভাবে বললো, 'মাসুদ, তুমি কিন্তু বেশি কথা বলছো। আমরা খুব খারাপ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এ সময় কথা কম বলা উচিত।'

'তাহলে কেউ কিছু বলতে রাজি নয়। বুয়া, তোমার কি মত ? তুমি তো সবই টের পেতে, কি ঘটতে যাচ্ছে !' মাসুদ হাল ছাড়লো না।

'মাসুদ, আমারও মনে হচ্ছে তুমি বেশি বক বক করছো।'

'বেশ তো, আমরা সবাই এক এক টুকরো কাগজে নাম লিখে রেখে দিই। যার নাম বেশিবার উঠবে···'অসহিষ্ণু কঠিন ও সামান্য উচ্চ কণ্ঠে খোদেজা বললো, 'কি ছেলেমানুষী হচ্ছে, মাসুদ। তোমার কি বয়স কমছে ?'

ধমক খেয়ে দমে গেলো মাসুদ, 'না। আমি সবাইকে ভাবতে বলছিলাম।'

'তুমি না বললেও সবাই ভাববে,' তিক্তস্বরে বললো খোদেজা।

আট

সূর্যমহলে রাত নামলো। কিন্তু সূর্যমহলের মানুষদের কারো চোখে ঘুম নামলো না।

ফরহাদ যেদিন থেকে শারীরিক ভাবে পঙ্গু হয়ে গেলো, সেদিন থেকেই তার মানসিক জগতটা অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠলো। বরাবরই সে ছিলো বুদ্ধিমান। বুদ্ধির খেলায় মেতে উঠে সে তার অচল অঙ্গের অভাব পূরণ করলো। অনেক সময় সে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা কোনো মন্তব্য করে তার প্রতিক্রিয়া দেখতো। এই খেলায় মেতে উঠে একসময় আবিষ্কার করলো, মানব চরিত্রের ভিন্নতা সে বুঝতে পারে।

আগে সে তার চারপাশের মানুষদের কাউকে পছন্দ করতো, কাউকে অপছন্দ করতো। কেউ কেউ তাকে বোর করেছে ; কারো সঙ্গ আবার তাকে আনন্দ দিয়েছে। ব্যস ঐ পর্যন্তই। সে ছিলো কর্মবীর। চিন্তা-ভাবনা খুব একটা করতো না। কিন্তু

এখন সে প্রতিটি মানুষকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে। ভেতরটা জানবার চেষ্টা করে।

আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো, তার স্ত্রীর পরিবার সম্পর্কে সে কতো কম জানে। এমন কি স্ত্রীকেই বা কতটুকু সে চেনে!

মণির শান্ত, সিরিয়স ভাবটা তার পছন্দ ছিলো। লক্ষ্মী মেয়ে মণির প্রেমে সে পড়েছিলো। অবশ্য তার বাবার অর্থও একটা গুরুত্ব বহন করেছিলো এ সম্পর্কের ভেতর। মণি এতোই সিরিয়স যে, অনেক সময় সে ফরহাদের ঠাট্টা ধরতে না পেরে নির্বোধের মতো তাকিয়ে থেকেছে। কিন্তু আসলেই সে মণিকে কতখানি জানে? তার মনে কি কথা খেলা করছে তা ফরহাদের অজানা। সে কি বোঝে, কতটা বোঝে ফরহাদ তা জানে না।

তার প্রতি মণির যে প্রচণ্ড আবেগাক্রান্ত প্রেম, যে গভীর ভালবাসা, তাকে ফরহাদের শৃঙ্খল মনে হয়। বুকচাপা ভারি বোঝার মতো মনে হয়। অন্যদের ক্ষেত্রে অনুগত্য আকাঙ্ক্ষিত বা সহনীয়, কারণ দিনের অধিকাংশ সময় তারা বাইরের নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। ফরহাদের মতো বেকার, পঙ্গু, গৃহবন্দী মানুষের কাছে তা অসহনীয় লাগাটা বিচিত্র নয়!

কি হতে পারে আর না পারে তা নিয়ে ভাবতে তাই ফরহাদের ভালো লাগে। এ-ও যেন এক ধরনের মুক্তি।

ফরহাদ তার শাশুড়ীকে পছন্দ করতো না। তিনিও তাকে সুনজরে দেখতেন না। তিনি চাননি মণি তাকে বিয়ে করুক।

ফরহাদের ধারণা, সে কেন, মণি আদৌ কাউকে বিয়ে করুক তা তিনি চাইতেন না। অথচ বিয়ের পর মণি সুখ ও স্বাধীনতা পেয়েছিলো। তারপরই নেমে এলো বিপর্যয়। সূর্যমহলে থাকার প্রস্তাব সে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলো। যে মানুষ পঙ্গু, সে তো অর্ধমানব! কি আসে-যায় সে কোথায় বসবাস করছে।

রাহেলা চৌধুরীর মৃত্যুতে ফরহাদ খুব একটা দুঃখ পায়নি। অবশ্য তিনি যদি কোনো অসুখে মারা যেতেন, তাহলে ভালো হতো। খুন-টুন না হলেই ভালো ছিলো। কাল আবার হাসান আলী আসবেন। আবার সেই জেরা।

মণি চুল আঁচড়াচ্ছিলো। তার নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড বিরক্তি লাগলো ফরহাদের।

'মন, তোমার কাহিনী তৈরি রেখেছো তো?'

'কাহিনী!' বিস্মিত প্রশ্ন মণির।

'আমার মাননীয়া শাশুড়ী যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তুমি কি কি করেছিলে, তা তোমাকে কাল আবার বলতে হবে।'

'ওহ্, তাই।' যেন নিশ্চিন্ত হলো মণি, 'সে কবেকার কথা। মনে থাকলে তো!'

'কিন্তু হাসান আলীর মনে আছে। শুধু মনে আছে নয়, ওর কাছে লেখা আছে সব।'

'ও।'

'তবে তোমার বলার মতো তেমন কোনো কথা নেই। তুমি আর আমি এই ঘরেই ছিলাম। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে তুমি যে একবার বেরিয়েছিলে সেকথা বলে বসো না

যেন!'

'সে তো বাথরুমে যাবার জন্য।'

'সে সময় কিন্তু বলোনি।'

'ভুলে গিয়েছিলাম।'

'অথবা বলতে লজ্জা করেছিলো। যাই হোক, তখন যখন বলোনি, এখনো বলো না। আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমরা দু'জনে ঘরে বসেই তাস খেলছিলাম—হানিমুন ব্রিজ। ছ'টা থেকেই, যতক্ষণ না খোজেদা চিৎকার দেয়। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' আগ্রহশূন্য কণ্ঠে বললো মণি।

'মন, তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না, কে খুন করেছে। মাসুদ ঠিকই বলেছে, আমাদেরই মধ্যে কেউ করেছে কিন্তু।'

'তুমিও না, আমিও না।'

'ব্যস। এতেই তুমি খুশি? সত্যি মন, তোমার তুলনা হয় না!'

লজ্জা পেলো মণি, 'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?'

'কিন্তু আমার কৌতূহল আছে। আমি এ রহস্যের শেষ দেখতে চাই। পুলিশের চেয়ে আমাদের অবস্থা একটু ভিন্ন। আমরা এ বাড়ির সবাইকে কাছে থেকে দেখেছি। চিনি। বিশেষ করে তুমি।'

'আমি এটা নিয়ে ভাবতে চাই না। জানতেও চাই না কে খুন করেছে। না জানাটাই ভালো।'

'বোকা মেয়ে, না জেনে আমাদের কোনো উপায় নেই। কারণ আমাদের ইতিমধ্যেই আগুনে ঝাঁপ দিতে হয়েছে।'

'তার মানে ?' মণি বিছানায় এসে বসলো।

'হাসির কথা-ই ধরো না। ডাঃ মামুন হায়দার। ভালো ছেলে। সে ভাবে না, হাসি অপরাধী। আবার নিশ্চিতভাবে জানেও না যে, হাসি নির্দোষ। হাসি এ কাজ করতেও পারে। সেটা তুমি আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে। তবে যদি সে খুন না করে থাকে, সারা জীবন কি বলতে থাকবে আমি করিনি ?'

'কি সব আবোল-তাবোল যে তুমি ভাবো।'

'আবোল-তাবোল নয়, মন। তোমার বাবার কথা ধরো। রেহানা কিরকম মুষড়ে পড়েছে দেখেছো ?'

'বাবার এ বয়সে আবার বিয়ে করার কি দরকার ?'

'তিনি দরকার মনে করছেন। এবং তাঁদের সম্পর্কই খুন করার ব্যাপারে মারাত্মক মোটিভ হিসেবে কাজ করছে।'

'বাবা মাকে খুন করেছেন এটা ভাবাই যায় না। এরকম কখনো ঘটে না।'

'ঘটে। কাগজে পড়োনি ?' মণি ফরহাদের মাথার বালিশটা ঠিক করে দিলো। ফরহাদই আবার বললো, 'মাসুদ কি যেন ভাবছে। টিনা অবশ্য বরাবরের মতো শান্ত আছে। এসব মানুষের আবার ভেতরে কি আছে বোঝা কঠিন। তারপর বেচারা খোদেজা...'

'ঠিক ধরেছো। এটা কিন্তু হতে পারে।'

'সে নিজেও সেটা ভাবছে। তাকেই সবার পক্ষে খুনী ভাবাটা সুবিধাজনক। হাসির মতো তার পক্ষেও নির্দোষিতা

প্রমাণ করা কঠিন।'

'তুমি থামবে! এসব তোমাকে ভাবতে কে বলেছে?'

'কেউ না। আমি ভাবতে চাই। সত্যকে জানতে চাই,' চিন্তিত স্বরে বললো ফরহাদ।

হাল ছেড়ে দিয়ে মণি বললো, 'কিন্তু কেমন করে?'

'সবাইকে দেখবো। ভালো করে লক্ষ্য করবো। সবার সাথে কথা বলবো। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখবো। মন, তুমি কি নিরপরাধীকে সাহায্য করতে চাও না?'

'না।' শব্দটা বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এলো মণির মুখ থেকে। ফরহাদের বুকে মুখ রেখে সে বললো, 'দোহাই লাগে তোমার, এসবে জড়িয়ে পড়ো না। ছেড়ে দাও, প্লীজ, ছেড়ে দাও।'

ফরহাদ মণির রেশমের মতো চুলের উপর হাত রাখলো, 'বেশ, তাই হবে।'

মাসুদ চৌধুরী নির্ঘুম চোখে শুয়ে ছিলো অন্ধকার ঘরে।

তার মন বার বার অতীতে ফিরে যাচ্ছে। মাসুদ চায় না সেসব কথা মনে করতে। তবু কেন তাকে ফিরে যেতে হয়! কি অসহ যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায়।

মাসুদের স্পষ্ট মনে পড়ে সেই বস্তির বাড়ি। রাস্তার খেলাধুলা। খেলার সাথীরা। মাকে মনে পড়ে। মায়ের চণ্ডাল রাগ আর উচ্ছল হাসি। রেগে গেলে তাকে ধরে পেটাতো। আর

আনন্দে উছলে উঠলে কোলে বসিয়ে গান গাইতো। রেল লাইনের ধারে ছিলো সেই বস্তি। লাগামহীন সেই দিনগুলির কথা মাসুদ কিছুতেই ভুলতে পারে না।

মায়ের কাছে নানা রকম লোক আসতো। মা পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে তাদের সঙ্গে গল্প করতো। তারা মাসুদকে কিছু বলতে সাহস করতো না। কারণ ঐ একটা ব্যাপারে মা তাদের খাতির করতো না।

তারপর সব গোলমাল হয়ে গেলো। তাকে চলে আসতে হলো এখানে, এই বাড়িতে। প্রাণহীন, নিরানন্দ এক পরিবেশে, যেখানে কোনো বৈচিত্র্য নেই। অচেনা, বিস্বাদ খাবার খেতে হতো। নিয়ম মেনে চলতে হতো। সন্ধ্যা সাতটায় বিছানায় যেতে হতো। মাসুদ সে সময় কাঁদতো মা আর সেই বস্তির বাসার জন্যে। এই মহিলা, রাহেলা চৌধুরী তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। ভালো ভালো কথা, আদর, আরাম-আয়েস, সব দিতে চেষ্টা করতেন। বিনিময়ে তিনি যে ভালবাসা পেতে চেয়েছিলেন, মাসুদ তা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। সে ভাবতো, এভাবে তো আর সারাজীবন চলবে না। সে অপেক্ষা করবে সেই উজ্জ্বল দিনটির, যেদিন সে ফিরে যেতে পারবে বস্তির সেই বাড়িতে, রাস্তার খেলার সাথীদের কাছে, তার মায়ের কাছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো—মাসুদের আর ফিরে যাওয়া হলো না। ঐ মহিলার সন্তান হয়ে বেঁচে থাকতে হলো। না, মাসুদের মা মারা যায়নি। তাকে ফিরিয়ে নেবার কোনো

ইচ্ছে তার ছিলো না। আসলে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দিয়েছে তার মা।

এতদিন পর, এই বয়সেও মাসুদের চোখের পাতা ভিজে উঠলো, তার মা তাকে ভালবাসে না! এই বেদনা মাসুদের বুকে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিলো। আজও তার হাত থেকে মুক্তি পায়নি সে!

সেই শৈশব থেকেই মাসুদ ঘৃণা করেছে রাহেলা চৌধুরীকে, যিনি অর্থের বিনিময়ে মাসুদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কিনতে চেয়েছিলেন। যার সামনে মাসুদ ছিলো অসহায়।

শৈশবের সেই প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা নিয়ে মাসুদ রাহেলা চৌধুরীকে খুন করতে চেয়েছে—কোনদিন, বড় হয়ে, তাঁর সমান শক্তি অর্জন করে।

স্কুলের দিনগুলি ততো খারাপ ছিলো না। বিশেষ করে হোস্টেলে থাকতে হতো বলে। অসহ্য লাগতো ছুটির সময়, রাহেলার নির্দেশে যখন তাকে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয়েছে।

আরো বড় হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার মাকে খুঁজতে গিয়েছিলো মাসুদ। পায়নি। বেশ ক'বছর হলো মারা গেছে। মরার সময় মাসুদের মা এক নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দা ছিলো।

এরপর তো মাসুদের ভুলে যাওয়াই উচিত ছিলো। তবু কেন সে ভুলতে পারে না! তবু কেন তার শৈশব তাকে তাড়া করে ফেরে! বুকের ভেতরে বেদনার যে রক্তক্ষরণ, তা তো আজও বন্ধ হলো না।

রাহেলা চৌধুরী তাকে কিনেছিলেন। তাঁর পক্ষে সব সম্ভব ছিলো। এমন কি সন্তান কেনাও। নিজেকে তিনি কি ঈশ্বর ভাবতেন? কিন্তু তাতো তিনি ছিলেন না। মাথায় একটি আঘাতেই তিনি জাঁদরেল রাহেলা চৌধুরী থেকে হয়ে গেলেন লাশ। আর দশটি লাশের মতোই।

কিন্তু মাসুদের কি হলো? এতো উদ্বেগ কেন এলো? রাহেলা মৃত বলেই কি মাসুদ তাঁকে আর ঘৃণা করতে পারছে না?

এই কি মৃত্যু?

মাসুদ ঘৃণাহীন এক ভয়াবহ অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগলো।

নয়

উৎকণ্ঠিত খোদেজা পানের বাটায় হাত দিয়েও আবার সরিয়ে রাখলো। ধবধবে সাদা বিছানায় গিয়ে বসলো।

পুলিশ হয়তো তাকে সন্দেহ করছে। ডঃ কায়সার কেন এসেছিলেন!

জাফরের মুখ মনে পড়লো। কে বলেছে ন্যায়বিচার হয়নি?

মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ ছিলো, উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে সে। খোদেজা তাকে আশৈশব চেনে। তবু তার চেহারায় এমন কমনীয়তা ছিলো যে নিজের অজান্তেই তাকে ক্ষমা করে শাস্তি থেকে বাঁচাবার ইচ্ছে জাগতো। এমন সুন্দর ভাবে সে মিথ্যে বলতো, যে সেটাকে সত্যি বলে সবাই ভুল করতো। ডঃ কায়সারেরও যে ভুল হয়নি তা কে বললো। জাফর সব ম্যানেজ করতে পারতো। খোদেজার চেয়ে তাকে বেশি আর কে চেনে?

কাল পুলিশ আসবে। আজ সবাই কেমন যেন সন্দেহের চোখে একে অপরকে দেখছে। খোদেজা এদের সবাইকে রাহেলা চৌধুরীর চেয়ে বেশি চেনে ও ভালবাসে। রাহেলা মাতৃস্নেহ ও অধিকারবোধে অন্ধ ছিলো। খোদেজা তাদের একক ব্যক্তি হিসেবে দেখেছে, দোষ-গুণ সব মিলিয়ে।

তার মধ্যে রাহেলার মতো তীব্র, বিকারগ্রস্ত মাতৃত্ব কখনো ছিলো না। চিরকুমারী খোদেজার কখনো বিয়ে হলে স্বামীকে হয়তো খুব ভালবাসতে পারতো।

রাহেলার কথা ভাবলো সে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করতেন। স্বামীর দিকে মোটেই নজর ছিলো না। ভদ্রলোক অতিরিক্ত ভালো মানুষ। রেহানা তাঁর যোগ্য স্ত্রী হতে পারতো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটা কি আর সম্ভব?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খোদেজা ভাবতে চাইলো তাদের কি হতে পারে! খুঁজলে সবারই মোটিভ পাওয়া যায়। মাসুদের গভীর বেদনাবোধ আর পালিতা মায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে যে বড় হয়েছে; অস্থির চিত্ত হাসির যে তরুণ ডাক্তারের ভাল-

বাসায় স্থিতি খুঁজছে, আনিস চৌধুরী ও রেহানার, যাদের মোটিভ ও সুযোগ, দু'টোই ছিলো ; টিনা, ওই শান্ত, আত্মকেন্দ্রিক মেয়েটির অথবা স্বার্থপর, শীতল-হৃদয় মণির, যে বিয়ের আগে কখনো কারো প্রতি মমতা বা ভালবাসা দেখায়নি।

রাহেলা চৌধুরীকে খোদেজা কবে থেকে অপছন্দ করা শুরু করেছিলো মনে করতে পারে না। তিনি খুব বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন। সব কিছু তিনিই ভালো জানেন, ভালো বোঝেন বলে মনে করতেন। খোদেজার উপর খবরদারি তো ছিলোই। সেসব খোদেজার মোটেও ভালো লাগতো না। এভাবেই হয়তো অবচেতন মনে বিরাগ জমতে শুরু করে!

না, রাহেলা চৌধুরীর কথা সে ভাববে না। রাহেলা মৃত। সে এবং অন্যান্যরা যারা বেঁচে আছে, তাদের কথা ভাবা দরকার। এবং কাল কি ঘটতে পারে, সেটাও ভাবা দরকার।

চমকে ঘুম থেকে উঠে বসলো মণি। স্বপ্ন দেখছিলো সে। দুঃস্বপ্ন। সে যেন শৈশবে ফিরে গেছে। আনিস ও রাহেলা চৌধুরী তাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন!

কতটুকু ছিলো সে? পাঁচ কি ছ' বছর? প্রথম যখন তাকে চৌধুরী দম্পতি নিয়ে এলেন, তখন উত্তেজনা ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলো সে। মোজাইক করা ঘর, ধবধবে সাদা বাথটাব ও বেসিন ফিট করা বাথরুম, পালকের মতো নরম বিছানা, গাড়িতে চড়ে বেড়ানো। তখনই মনে হয়েছিলো, যদি এসব তার নিজের হতো। চিরদিনের জন্য।

সেটা হওয়া খুব একটা সমস্যার কিছু ছিলো না। শুধুমাত্র একটু ভালবাসা দেখানো। যদিও তার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার ন্যাকামো কখনোই ছিলো না, তবু সে ম্যানেজ করেছিলো। কারণ প্রয়োজনটাকে সে জীবনে সবার উপরে স্থান দেয়। রূপ-কাহিনী শেষ পর্যন্ত বাস্তব হয়। মণি ধনী বাবা-মায়ের আদুরে দুলালী হিসেবে রয়ে যায়।

হোমটা না খুললেই ভালো হতো। বাকি ছেলে-মেয়েগুলো আসতো না। কিম্বা কে জানে, হয়তো আসতো। রাহেলা চৌধুরীর মাতৃত্বের কামনাকে মণির প্রায় জান্তব মনে হয়।

কোথা থেকে কতগুলো ছেলে-মেয়ে তিনি ধরে আনলেন। জাফরের মতো ক্রিমিনাল, হাসির মতো ভারসাম্যহীন, মাসুদের মতো বন্য, টিনার মতো অজাত! সবাই বিদ্রোহ করেছিলো। করবে না কেন? ওদের স্বভাবটা বা পারিবারিক পটভূমি তো দেখতে হবে। অবশ্য বিদ্রোহ সে নিজেও কিছু কম করেনি। রাহেলা চৌধুরী চাননি মণি ফরহাদকে বিয়ে করুক। কিন্তু মণি তীব্রভাবে চেয়েছিলো। বাবা তাকে সমর্থন করেন। ফলে বিয়েতে বাধা দিতে পারেননি মা।

সে ফরহাদকে একান্তভাবে নিজের করে চেয়েছিলো। মায়ের শাসনের আওতা থেকে দুরে সরে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! ফরহাদও রাজি ছিলো সূর্যমহলে থাকতে, তার মনে হয়েছিলো এটাই অনিবার্য। কিন্তু মণি রাজি হয়নি। সে ফরহাদকে রাহেলার মাতৃত্বের কারাগারে বন্দী হতে দিতে চায়নি। সে নিজেও মাতৃত্ব চায়নি। সে শুধুই ফরহাদকে চেয়ে-

ছিলো।

ফরহাদ সূর্যমহলে থাকতে বেশ পছন্দ করে। সে তার বাবার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। হাসির সঙ্গও পছন্দ করে। মণির প্রচণ্ড রাগ হয়, কই সে তো আর কাউকে চায় না। ফরহাদ কেন চায়?

রাহেলা চৌধুরী মরে গিয়েও মণির জীবন থেকে সরছেন না। ফরহাদ কেন এ রহস্য উন্মোচন করতে চাইছে? যা তার ভাবনার বিষয় নয়, কেন তা ভেবে আকুল হচ্ছে? কেন সে ফাঁদ পেতে অপরাধীকে ধরতে চাইছে?

ফাঁদ! কি ধরনের ফাঁদ?

নির্ঘুম রাত শেষে একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটতে দেখলেন আনিস চৌধুরী।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তিনি তলিয়ে দেখেছেন, ঠিক যেভাবে দেখবেন পুলিশ অফিসার হাসান আলী।

রাহেলা এসে তাঁদের জাফরের সঙ্গে ঝগড়ার কথা বললেন। জাফর যে শাসিয়ে গেছে সেকথাও জানালেন। রেহানা তখন কায়দা করে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলো। তিনি রাহেলাকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে, জাফরের শিক্ষা হওয়া দরকার। বার বার তাকে বাঁচাবার কোনো অর্থ নেই। ইত্যাদি।

রেহানা ফিরে এলো। চিঠিগুলো তুলে নিয়ে জানতে চাইলো, তার করণীয় আর কিছু আছে কিনা। তিনি বললেন, না। রেহানা বিদায় নিয়ে চলে গেলো। প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে

সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাহেলার ঘরের পাশ দিয়ে একেবারে বাইরে। কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি।

এবং আনিস চৌধুরী লাইব্রেরীতে একা বসেছিলেন। কেউ ছিলো না। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে রাহেলার ঘরে গিয়েছিলেন কিনা কেউ জানে না।

এরকম হতে পারে—তাঁদের দু'জনেরই সুযোগ ছিলো। মোটিভও ছিলো। কারণ তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসেন।

আসলে তাঁরা অপরাধী বা নির্দোষ একথা বলার মতো কোনো সাক্ষী নেই।

সূর্যমহলের বেশ বাইরে, ভিন্ন একটি ছাদের নিচে শুষ্ক ও নির্ঘুম চোখে রেহানা ভাবছে। তার হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ। তার স্পষ্ট মনে পড়ছে রাহেলা চৌধুরীকে সে কতখানি ঘৃণা করতো।

এখন এই অন্ধকারে, রাহেলার কণ্ঠ যেন সে শুনতে পাচ্ছে, 'তুমি ভেবেছো আমি মরে গেলে আমার স্বামীকে তুমি পাবে। না, তুমি পাবে না। আমার স্বামীকে তুমি কখনই পাবে না।'

হাসি স্বপ্ন দেখছে। সে আর মামুন হাঁটছে। একটা অতল গহ্বরের সামনে এসে মামুন অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। হাসি একা। গহ্বরের ওপারে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ কায়সার।

কণ্ঠে সবটুকু বিতৃষ্ণা ঢেলে হাসি চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি তাহলে কে?

আমার এ কি করলেন ?'

তিনি জবাব দিলেন, 'কিন্তু আমি তো শুধু সাহায্য করতে এসেছিলাম।'

হাসির ঘুম ভেঙে গেলো।

ছোট্ট ছিমছাম ঘরে শুয়ে আছে টিনা। অনেক চেষ্টা করেও তার ঘুম এলো না।

সে রাহেলা চৌধুরীর কথা ভাবলো। কৃতজ্ঞতা নিয়েও নয়, বিতৃষ্ণা নিয়েও নয়। ভালবাসা নিয়ে—কারণ তাঁর জন্যেই সে অন্ন পেয়েছে, বস্ত্র পেয়েছে, আরাম পেয়েছে। সে রাহেলা চৌধুরীকে ভালবাসতো। তাঁর মৃত্যু তাকে দুঃখ দিয়েছে।

না, ব্যাপারটা এতো সহজ না। জাফর যখন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত ছিলো, তখন কিছু আসে-যায়নি।

কিন্তু এখন···

দশ

একটু বেশি বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন হাসান আলী। যেন বোঝাতে চাইছেন পুরো ব্যাপারটা।

'আমি জানি বিষয়টি আপনাদের জন্যে খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। খবরের কাগজে তো দেখেছেনই জাফরের দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে।'

শান্ত স্বরে আনিস চৌধুরী বললেন, 'তার মানে আবার তদন্ত হবে। তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আপনারা ভুল করেছিলেন।' মেনে নিলেন হাসান আলী, 'জ্বি, ভুল আমাদের হয়েছিলো। ডঃ কায়সারের সাক্ষ্য না থাকায় সেটাই অবধারিত সত্য বলে মনে হয়েছিলো।'

'জাফর তো বলেছিলো তাকে এক ভদ্রলোক লিফ্‌ট দিয়েছিলো।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেরকম কোনো ভদ্রলোককে খুঁজে পাইনি।'

একটু থেমে বিব্রতভাবে বললেন হাসান আলী, 'আমি জানি আপনাদের মনোভাব কি! কতখানি বিতৃষ্ণ আপনারা এ ব্যাপারে। আমি সাফাই গাইছি না। আমাদের, অর্থাৎ পুলিশের কাজ সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা। পাবলিক প্রসিকিউটর তার উপর সিদ্ধান্ত নেন। আমি অনুরোধ করবো, মন থেকে যতোটা সম্ভব তিক্ততা দূর করে আপনারা সেদিনের ঘটনা মনে করুন।'

'আপনাদের কাছে নিশ্চয় আমাদের মূল বিবৃতি আছে। এখন যা বলবো তা হয়তো আরো বেঠিক হবে। মাঝে অনেক সময় চলে গেছে।' আবারও বললেন আনিস চৌধুরী।

'জানি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে সময় চোখ

এড়িয়ে গেছে এমন কোনো সূত্র হঠাৎ বেরিয়ে এলো।'

'হয়তো বা সময়ের ব্যবধানের জন্যেই ঘটনার দিকে আমরা ভালভাবে দৃষ্টি দিতে পারবো,' বললো ফরহাদ। হাসান আলী সাগ্রহে তাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে।' মনে মনে ভাবলেন, বুদ্ধিমান ছোকরা। কে জানে, এ বিষয়ে তার নিজস্ব কোনো ধারণা আছে কিনা।

আনিস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে হাসান আলী বললেন, 'আপনাকে দিয়ে শুরু করি। বিকালের চায়ের সময় ছিলো সেটা।'

'হ্যাঁ। খাবার টেবিলে চা দেয়া হয়েছিলো। মণি ছাড়া আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। মণি ওর আর ফরহাদের চা নিয়ে ঘরে চলে গিয়েছিলো।'

'আমি তখন সবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি,' বললো ফরহাদ।

'ও। আপনারা সবাই মানে?' হাসান আলী ফরহাদের দিক থেকে আনিস চৌধুরীর দিকে চোখ ফেরালেন।

'আমি, আমার স্ত্রী, মেয়ে হাসি, রেহানা ও খোদেজা। চা খেয়ে আমি ও রেহানা লাইব্রেরীতে এলাম। মধ্যযুগের অর্থনীতির উপর বইটা লেখার ব্যাপারে আমার কাজ ছিলো। আমার স্ত্রী তাঁর অফিসঘরে গেলেন। নতুন একটা শিশু-পার্কের ব্যাপারে কিসব কাগজ পত্র তৈরি করছিলেন। জানেনই তো, তিনি খুব ব্যস্ত থাকতেন।'

'আপনার ছেলে জাফর যে এসেছিলো তা আপনি জান-

তেন না ?'

'কলিং বেলের শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু আমি তখন পঞ্চদশ শতকে ছিলাম, বিশ শতকে নয়। তাই ওটা নিয়ে আর ভাবিনি।'

'তারপর ?'

'বেশ কিছুক্ষণ পর আমার স্ত্রী এলেন।'

'কতক্ষণ পর ?'

ভ্রূ কুঁচকে গেলো আনিস চৌধুরীর, 'ঠিক বলতে পারবো না। সঠিক সময়টা নিশ্চয় প্রথমবারের বিবৃতিতে দিয়েছিলাম। আধ ঘণ্টা—না, বোধহয় বেশি—পৌনে এক ঘণ্টা হতে পারে।'

রেহানা অকম্পিত কণ্ঠে বললো, 'আমরা সাড়ে পাঁচটায় চা খাওয়া শেষ করেছিলাম। প্রায় ছ'টা চল্লিশে মিসেস চৌধুরী লাইব্রেরীতে এসেছিলেন।'

'তিনি জানালেন যে, জাফর এসে হৈ-চৈ করে গেছে। টাকা চেয়েছে। বলেছে সে বিপদগ্রস্ত, টাকা না পেলে তাকে জেলে যেতে হবে। কিন্তু রাহেলা তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাকে একটা পয়সাও দেবেন না। কাজটা ঠিক হলো কিনা তা নিয়ে সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি।'

'মিঃ চৌধুরী, একটা প্রশ্ন করবো ?'

'করুন।'

'আপনার ছেলে যখন টাকা চাইলো, তখন আপনার স্ত্রী আপনাকে কেন ডাকেননি ? ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয় কি ?'

'না। আমার তা মনে হয় না।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিলো?'

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আনিস চৌধুরী বললেন, 'চমৎকার। আমার স্ত্রী এসব বিষয় একাই দেখতেন। আমি কি ভাবছি তা তিনি আগেই বুঝে যেতেন এবং সেটা নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতেন। অনেক সময় কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে পরেও আমার সাথে আলোচনা করেছেন। জাফরকে নিয়েও আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। বহুবার টাকা দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাকে। আমরা ঠিক করেছিলাম এরপর জাফর কিছু করলে তাকে ঠেকে শিখতে হবে।'

'আপনার স্ত্রীকে কি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিলো?'

'হ্যাঁ। আসলে জাফর না শাসিয়ে নরম হয়ে টাকা চাইলে রাহেলা হয়তো দিয়েই দিতো।'

'আপনার স্ত্রী যখন আপনাকে এসে সব জানালেন, তখন কি জাফর চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিজে দেখেছেন, না মিসেস চৌধুরী আপনাকে জানিয়েছিলেন।'

'রাহেলা বলেছিলেন। জাফর নাকি যাবার আগে শাসিয়ে গেছে যে, সে যদি ফিরে এসে টাকা না পায় তাহলে দেখে নেবে।'

'আপনারা কি ভয় পাননি জাফর ফিরে আসতে পারে ভেবে? ভেবে বলুন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'কক্ষণো না। জাফরের এসব তর্জন-গর্জনে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম।'

'একবারও ভাবেননি জাফর যা বলেছে তা করতে পারে?'

'না। তাই আপনারা জাফরকে গ্রেফতার করায় আমি খুবই অবাক হই। এবং এখন দেখলেন তো, সত্যিই জাফর এ কাজ করেনি।'

'হ্যাঁ। আপনার স্ত্রী লাইব্রেরী থেকে কখন চলে গেলেন?'

'সাতটার কিছু আগে। ধরুন মিনিট সাতেক আগে।'

হাসান আলী রেহানার দিকে ফিরলেন, 'চৌধুরী সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর কথাবার্তার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'প্রথমে এই ঘরেই ছিলাম। মনে হলো তাঁদের পারিবারিক আলোচনায় আমার থাকা উচিত নয়। তাই পেছনের ছোট ঘরটায় চলে গিয়েছিলাম। ওখানে বসে কিছু টাইপ করি। মিসেস চৌধুরী চলে গেলে আমি আবার এ ঘরে ফিরে আসি।'

'এরপর আপনি কতক্ষণ ছিলেন?'

'মিঃ চৌধুরী জানান আর কোনো কাজ নেই। তাই আমি সাতটা পাঁচে চলে যাই।'

'আপনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস চৌধুরীর ঘরের দরজা খোলা ছিলো?'

'হ্যাঁ। প্রায় এক ফুটের মতো ফাঁক ছিলো।'

'আপনি বিদায় নেয়ার জন্যে ঢোকেননি?'

'না।'

'যাবার আগে ওঁকে বলে যাবার রেওয়াজ ছিলো না?'

'না। তিনি ব্যস্ত মানুষ ছিলেন, কাজে ব্যাঘাত ঘটানো পছন্দ করতেন না, সেজন্যে যেতাম না।'

'গেলে হয়তো আপনি তাঁর মৃতদেহ দেখতে পেতেন সেদিন।'

'হয়তো।'

'আপনি কি সোজা বাড়ি চলে যান?'

'হ্যাঁ। আমার বাড়িওয়ালির সঙ্গে গেটে দেখা হয়।'

'কিন্তু পথে কি কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?'

'যতদুর মনে পড়ে, না।' ভ্রূ কুঁচকালো রেহানা, 'ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার ছিলো। তবে বাড়ির কাছাকাছি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় অনেককেই দেখেছিলাম।'

'কোনো গাড়ি কি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা গাড়ি আমার শাড়িতে কাদা ছিটিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলো। শাড়িটা পরদিনই ধুতে দিয়েছিলাম। তবে কি ধরনের গাড়ি জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবো না।'

হাসান আলী আবার আনিস চৌধুরীর দিকে তাকালেন, 'আপনি বললেন, আপনার স্ত্রী চলে যাবার পর আপনি কলিং বেলের শব্দ শোনেন?'

'মনে হয় শুনেছিলাম। আমি শিওর নই।'

'ক'টার সময়?'

'ঠিক বলতে পারবো না। ঘড়ি দেখিনি।'

'আপনার কি মনে হয়নি জাফর আবার ফিরে এসেছে ?'

'আমার কিছুই মনে হয়নি। আমি কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম।'

'একটা কথা। আপনি কি জানতেন আপনার ছেলে বিবাহিত ?'

'একেবারেই না।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'না। জানলে সে নিশ্চয় আমাকে বলতো। আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম যখন জাফরের স্ত্রী দেখা করতে এলো। মনে পড়ে খোদেজা ? তুমি যখন বললে, 'একটি মেয়ে এসে বলছে সে জাফরের বউ ? এটা হতে পারে না বলে খোদেজা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো।'

'প্রথমে বিশ্বাস করিনি,' বললো খোদেজা। 'মেয়েটি জোর দিয়ে বলার পর আমি চৌধুরী সাহেবকে জানাই। ব্যাপারটা এতোই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো...'

'আমি তার জন্যে যা পেরেছি করেছি।' বললেন আনিস চৌধুরী, 'মেয়েটি আবার বিয়ে করেছে, শুনেছেন হয়তো। জেনে খুব খুশি হয়েছি আমি !'

হাসান আলী হাসিকে প্রশ্ন করলেন, 'মিস চৌধুরী, আপনি সেদিন চা খাবার পর কি করেছিলেন ?'

'আমার মনে নেই,' গোঁয়ারের মতো বললো হাসি। 'দু'বছর আগের কথা। কি করেছিলাম কি করে মনে করবো এতদিন পর ?'

'আমার মনে হয় আপনি খোদেজাকে রান্নাঘরে সাহায্য করছিলেন।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলো খোদেজা। 'তারপর হাসি ওপরে চলে গেলো। ওর বাইরে যাবার কথা ছিলো।'

হাসির মধ্যে সহযোগিতার কোনো মনোভাবই দেখা গেলো না। সে বললো, 'সবই আপনাদের কাছে লেখা আছে। আবার কেন একই প্রশ্ন করছেন?'

'কারণ, কে বলতে পারে কোন্ কথাটার ফাঁকে কি সূত্র লুকিয়ে আছে। আপনি কখন বাইরে গিয়েছিলেন?'

'সাতটা। বা ঐরকম সময়।'

'আপনার মা ও ভাইয়ের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয় তা কি আপনি শুনেছিলেন?'

'না, আমি ওপরে ছিলাম।'

'আপনি বাইরে যাবার আগে আপনার মাকে দেখেছিলেন?'

'আমার হাতে টাকা ছিলো না। তাই চাইতে গিয়েছিলাম।'

'তিনি দিয়েছিলেন?'

'খোদেজা দিয়েছিলো।'

বিস্মিত হলেন হাসান আলী, 'কই, আগে তো একথা বলেননি?'

হাসি বললো, 'বলিনি তাতে কি? ঘটেছে এরকমই। আমি ঘরে ঢুকে টাকা চাইলাম। খোদেজা বাইরে যাচ্ছিলো। হল-ঘর থেকে শুনে বললো, তার কাছে টাকা আছে। মা বললো খোদেজার কাছ থেকে নিয়ে নাও।'

'আমি মহিলা সমিতি অফিসে যাচ্ছিলাম সেলাইয়ের নক্সা আনতে,' বললো খোদেজা।

হাসি বললো, 'আমাকে কে টাকা দিয়েছিলো সেটা তো বড় কথা নয়। আপনি জানতে চান আমি মাকে জীবিত দেখেছি কিনা! হ্যাঁ দেখেছি। মা টেবিলের উপর এক গাদা কাগজপত্র দেখছিলেন। আমাকে বরাবরের মতো তাড়াতাড়ি ফিরতে বললেন। আমি বেরিয়ে গেলাম।'

'আর আপনি?' খোদেজার দিকে ফিরলেন হাসান আলী।

'আমিও একই সময় বেরিয়ে যাই।'

হাসি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো। হাসান আলীর মনে হলো খোদেজা হাসিকে বাঁচাতে চাইছে। এমনও তো হতে পারে হাসির সঙ্গে রাহেলা চৌধুরীর ঝগড়া হয়েছিলো। সে-ই তাঁর মাথায় আঘাত করেছিলো। তিনি খোদেজার দিকে মনোযোগ দিলেন, 'আপনি বলুন আপনি কি মনে করতে পারেন।'

খোদেজাকে নার্ভাস মনে হলো।

'চা খাওয়া হয়ে গেলে রান্নাঘরে সব গুছিয়ে নেবার পর হাসি ওপরে চলে গেলো। তখন জাফর এলো।'

'আপনি তাকে দেখেছিলেন?'

'আমিই দরজা খুলে দিই। এরপর সোজা তার মা[illegible] গিয়ে বললো, 'আমি বিপদে পড়েছি। আমাকে উদ্ধ[illegible] আমি আর কোনো কথা শুনিনি। রান্নাঘরে চ[illegible]

'জাফরকে চলে যেতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ। সে হলঘরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিলো, তার মা যেন টাকা রেডি রাখেন। নইলে···। হ্যাঁ জাফর এভাবেই শাসিয়েছিলো, বলেছিলো, 'নইলে'।'

'তারপর ?'

'দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে জাফর চলে গেলো। রাহেলা বু' দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিলো। বললেন, 'শুনলে ?' আমি বললাম, 'জাফর আবার গোলমাল বাধিয়ে বসেছে ?' তিনি মাথা নেড়ে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্যে উপরে গেলেন।'

'আর আপনি ?'

'আমি রাতের খাবারের জন্যে টেবিল সাজালাম। তারপর মহিলা সমিতিতে গেলাম।'

'ফিরলেন ক'টার সময় ?'

'সাড়ে সাতটা হবে। আমার কাছে চাবি ছিলো। ঢুকেই আমি রাহেলা বু'র ঘরের দিকে গেলাম তাঁকে সমিতির সেক্রেটারীর একটা খবর পৌঁছাতে। তিনি তাঁর টেবিলের সামনে বসে ছিলেন। টেবিলে রাখা হাতের উপর মাথাটা নোয়ানো। ড্রয়ার খোলা। লোহার রডটা পাশেই রাখা। প্রথমে আমার মনে হয়েছিলো ডাকাতি। আমার ধারণাটাই ঠিক। বাইরের কোনো ডাকাতের কাজ ছিলো সেটা।'

'এমন কেউ যাকে মিসেস চৌধুরী দরজা খুলে দিয়েছিলেন ভেতরে আসার জন্যে ?'

'অসম্ভব নয়। তিনি খুবই দয়াবতী মহিলা ছিলেন। কেউ

কোনো বিপদের কথাব লে তাঁকে সহজেই কাবু করতে পারতো। নিশ্চয় এমন কিছুই ঘটেছিলো। কথাটা খুব জোর দিয়ে বলতে চাইলো খোদেজা। কিছুটা ব্যাকুল শোনালো তার কণ্ঠ। হাসান আলী ভাবলেন, তার আতঙ্ক কি নিজের জন্যে? সে-ও তো খুনী হতে পারে। মুখে বললেন, 'এমন সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন খোদেজা। নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসলো। হাসান আলী এবার মণি ও ফরহাদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা কেউ কিছু শোনেননি?'

'কিচ্ছু না।' ফরহাদ বললো।

'আমি চা নিয়ে ঘরে চলে গিয়েছিলাম,' বললো মণি। 'বুয়া চিৎকার করে না ওঠা পর্যন্ত আমরা দু'জন সেখানেই ছিলাম।'

'আপনারা ঘর ছেড়ে একেবারেই বেরোননি?'

'না, আমরা তাস খেলছিলাম,' বললো মণি নির্বিকার কণ্ঠে। ফরহাদের কেন যেন অস্বস্তি লাগলো। অথচ মণি তো তার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করছে। হয়তো ওর শান্ত, স্থির ভাবটাই তার অস্বস্তির কারণ। 'কি চমৎকার মিথ্যাবাদী তুমি, মন!' মনে মনে বললো ফরহাদ।

'তখন, এবং এখনো কোথাও যাবার যোগ্যতা আমার নেই,' বললো ফরহাদ।

'আপনি তো আগের চেয়ে অনেক ভালো,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন হাসান আলী। 'আপনি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন হাঁটতে পারবেন।'

'সে স্বপ্ন সুদূরের !'

হাসান আলী চৌধুরী পরিবারের আর দু'জনকে দেখলেন। মাসুদ হাত দু'টো আড়াআড়িভাবে বুকে বেঁধে বসে আছে। টিনা চেয়ারে হেলান দিয়ে রয়েছে। তাকে দেখে ইংরেজী 'গ্রেস ফুল' শব্দটা মনে পড়লো তাঁর। এরা দু'জন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি।

'আপনারা দু'জনেই সেদিন এ বাড়িতে ছিলেন না জানি। তবু, সেদিন সন্ধ্যায় কোথায় কি করছিলেন আবার একটু বলবেন ?'

'আমি একটা গাড়ি ঠিক করে টেস্ট করতে বেরিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, গাড়ি একটা জড় পদার্থ। সাক্ষী হতে পারবে না।'

টিনা ঘুরে সোজাসুজি মাসুদের চোখের দিকে তাকালো। কিন্তু তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটলো না।

'মিস চৌধুরী, আপনি ?' টিনাকে প্রশ্নটা করলেন হাসান আলী।

'আমি যে লাইব্রেরীতে কাজ করি সেটা সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ হয়। সামন্য কিছু কেনাকাটা সেরে আমি ঘরে ফিরি। নিজের খাবার নিজেই তৈরি করতে হয়। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বাকি সময়টুকু ক্যাসেটে গান শুনে কাটিয়ে দিই।'

'আপনি আর বাইরে যাননি ?'

মুহূর্তের জন্যে থেমে জবাব দিলো টিনা, 'না।'

'আপনার ঠিক মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনার তো বোধহয় একটা গাড়ি আছে।'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় রাখেন গাড়িটা?'

'রাস্তায়। ফ্ল্যাটবাড়িটার পাশেই।'

'আপনি কি আর কিছুই বলতে পারেন না যা আমাদের সাহায্যে আসতে পারে?' হাসান আলী নিজেই বুঝতে পারছেন না কেন তিনি জোর করছেন।

'আমি দুঃখিত। আমার আর কিছুই বলার নেই।'

মাসুদ চকিতে টিনাকে দেখলো।

হাসান আলী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'একটা ব্যাপার আমার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে যাচ্ছে।'

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন আনিস চৌধুরী।

'মিসেস চৌধুরী সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা তুলেছিলেন, তার কয়েকটি নোট জাফরের পকেটে পাওয়া গেছে। সে বলেছে তার মা তাকে ঐ টাকা দিয়েছেন। অথচ আপনি বলছেন আপনার স্ত্রী বলেছেন তিনি জাফরকে কোনো টাকা-পয়সা দেননি। ডঃ কায়সারের সাক্ষ্য অনুযায়ী জাফর ফিরেও আসেনি। তাহলে কে তাকে টাকা দিলো? আপনি?' শেষ প্রশ্নটি খোদেজাকে করলেন হাসান আলী।

'আমি? না, আমি না। আমি কেমন করে দেবো?' খোদেজার বিব্রত মুখে এক ঝলক রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিলো।

'মিসেস চৌধুরী কোথায় টাকা রাখতেন?'

'তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে।' খোদেজাই জানালো।

'তালা দেয়া থাকতো ?'

'শুতে যাবার আগে তিনি তালা দিয়ে যেতেন।'

'আপনি কি ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে আপনার ভাইকে দিয়েছিলেন ?' এবারের প্রশ্ন হাসির উদ্দেশ্যে।

'আমি জানতাম না যে জাফর এসেছে। তাছাড়া মাকে না জানিয়ে নেবোই বা কি করে ?'

'আপনার মা যখন উপরে আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন তখন চুপিচুপি নিতে পারেন।'

হাসি সোজা ফাঁদে পা দিলো, 'কিন্তু তখন তো জাফর চলে গেছে। আমি···' পাথরের মতো জমে গেলো হাসি।

'তাহলে আপনি জানতেন যে আপনার ভাই চলে গেছে।'

দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে গেলো হাসি, 'তখন জানতাম না, এখন জানি। আমি আমার ঘরে ছিলাম। আমি কিছু জানি না। কিছু শুনিনি। তাছাড়া জাফরকে টাকা দেবার ইচ্ছে আমার কখনো হয়নি।'

'আর আমি জাফরকে টাকা দিলে নিজের কাছ থেকে দিতাম, চুরি করে নয়।' রক্তিম অপমানিত মুখে জানালো খোদেজা।

'আমি সেকথা বলছি না। তাহলে আমরা ধরে নেবো মিসেস চৌধুরীই টাকা দিয়েছিলেন।'

'বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি দিলে আমাকে বলতেন,' বললেন আনিস চৌধুরী।

'হাজার হোক, মা তো!'

'আপনি ভুল করছেন। রাহেলা অন্যায় আবদার কখনো প্রশ্রয় দিতেন না।'

'এবার হয়তো দিয়েছিলেন। এছাড়া আর কোনো সমাধান তো আর আমরা পাচ্ছি না, বললো রেহানা।

হাসান আলী উঠে দাঁড়ালেন।

'আসি তাহলে। শেষ পর্যন্ত কি করতে পারবো জানি না। দেখা যাক।'

আনিস চৌধুরী তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন, 'যাক আজকের মতো তো রেহাই পাওয়া গেলো।'

'তাতে কি লাভ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো হাসি।

'হাসি মা, এমন ভেঙে পড়ে না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।' খোদেজা হাসির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, 'হাসি, ঘরে চলো।'

'আমি একাই যেতে পারবো। আমার কাউকে দরকার নেই।' হাসি ছুটে চলে গেলো।

অন্যমনস্কভাবে ফরহাদ বললো, 'এ হতে পারে না।'

'কি?' জানতে চাইলো রেহানা।

'আমরা কখনো সত্য জানবো না, তা হতে পারে না। আমার মন বলছে সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।'

'ফরহাদ, সাবধান হও!' বললো টিনা।

বিস্মিত ফরহাদ তাকালো তার দিকে, 'টিনা, তুমি কিছু জানো?'

মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে টিনা বললো, 'না। আমি কিছু জানতে চাই না।'

এগারো

পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু পেলেন ?'

'না, তেমন কিছু নয়। তবে সময়টা একেবারে নষ্ট হয়েছে এমনও নয়।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। স্থান ও কাল একই রয়েছে। রাহেলা চৌধুরী সাতটার কিছুক্ষণ আগেও জীবিত ছিলেন, স্বামী ও তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপরেও হাসি চৌধুরী তাঁকে দেখেছে। এমন হতে পারে যে, তাঁর স্বামী তাঁকে সাতটা পাঁচ থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে যে কোনো সময় খুন করতে পারে। রেহানা সাতটা পাঁচে বেরিয়ে যাবার সময় খুন করতে পারে। তার আগ মুহূর্তে হাসি করতে পারে। খোদেজা সাড়ে সাতটায় বাইরে থেকে ফিরে এসে করতে পারে। ফরহাদ অবশ্য পঙ্গু হিসেবে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। মণি চৌধুরী সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে নিচে নেমে খুন করতে পারে, যদি এ ব্যাপারে তার স্বামী সাক্ষ্য দিয়ে তাকে বাঁচায় তবে আলাদা কথা। অবশ্য

তার করার কোনো কারণ দেখছি না। আমি যা দেখছি তাতে মাত্র দু'জনের খুন করার মোটিভ রয়েছে—আনিস চৌধুরী ও রেহানা।'

'আপনার কি মনে হয়, এদের কেউ একজন কাজটা করেছে, নাকি দু'জনে মিলে?'

'দু'জন একসঙ্গে করেছে বলে মনে হয় না। কোনো কোনো আত্মকেন্দ্রিক, শান্ত মানুষ অনেক সময় বিগড়ে যায়। সে রকম কিছু হবে। পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা এদের পক্ষে করা সম্ভব বলে মনে হয় না।'

'আমরা এখন কি করবো?'

'বুঝতে পারছি না।' ধীরে ধীরে বললেন হাসান আলী।

'জানলেও প্রমাণ করবো কি করে?'

'আপনি কি নিঃসন্দেহ?'

'তা-ও না।'

'কেন?'

'আনিস চৌধুরী যে ধরনের লোক, তাতে এ কাজ তাঁকে দিয়ে সম্ভব কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। খুনটাই শুধু নয়, জাফরকে ফাঁসানোটা বিশ্বাস হতে চায় না।'

'ছেলেটি তাঁর নিজের নয়।'

'কিন্তু ছেলে-মেয়েদের সব ক'টাকে তিনি ভালবাসেন বলেই তো মনে হলো।'

'এমনও হতে পারে, তিনি ভেবেছিলেন জাফরের মৃত্যুদণ্ড হবে না। দশ বছর জেলে থাকলে ছেলেটির এমন কোনো ক্ষতি

হবে না।'

'সেটা অবশ্য সম্ভব।'

'রেহানা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'রেহানার জাফরের প্রতি কোনো টান থাকার কথা নয়। তাছাড়া এসব ব্যাপারে মেয়েরা একটু বেপরোয়া হয়।'

'তাহলে আপনি এটাই ভাবছেন?'

'জ্বি স্যার, মোটামুটি। সম্পূর্ণভাবে নয়। কি একটা সূত্র যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আমার জানা দরকার পরস্পর সম্পর্কে ওদের ধারণা কি।'

'তার মানে আপনি জানতে চান ওরা জানে কিনা হত্যাকারী কে?'

'আমি বুঝতে পারছি না, ওরা কি সবাই জেনে শুনে এটা সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে চায়? ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায় না। আমার মনে হয়, এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা রয়েছে। খোদেজার কথাই ধরুন। অত্যন্ত নার্ভাস। এমন হতে পারে কাজটা সে নিজেই করেছে। অথবা অন্য কারো জন্যে ভয় পাচ্ছে। পরেরটাই বেশি সম্ভব।'

'আনিস চৌধুরী?'

'না, আমার মনে হয় হাসির জন্যে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে।'

'হাসির পক্ষে কি এ কাজ সম্ভব?'

'কোনো মোটিভ যদিও নেই। তবে মেয়েটা প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ, আর কিছুটা ভারসাম্যহীনও বটে। তারপর টিনার কথা

ধরুন, যে মেয়েটা লাইব্রেরীতে কাজ করে। আমার মনে হয় সে কিছু জানে।'

'জানে, অথবা মনে করে যে জানে।'

'তাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। আমার ধারণা সে কিছু জানে। মাসুদের কথা ধরা যাক। সে যদিও সূর্যমহলে ছিলো না। কিন্তু গাড়ি নিয়ে একা বেরিয়েছিলো। এ অবস্থায় সে গাড়ি চালিয়ে সূর্যমহলে গিয়ে রাহেলা চৌধুরীকে খুন করে আসতে পারে। রেহানা একটা কথা বলেছে যা তার আগের বিবৃতিতে ছিলো না। সে বলেছে, একটা গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। যদিও সেটা অন্য যে-কোনো বাড়ির গাড়ি হতে পারে, আবার মাসুদের গাড়ি হবারও সম্ভাবনা রয়েছে।'

'কিন্তু মাসুদ কেন খুন করতে যাবে?'

'এই মুহূর্তে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কারণ একটা কিছু থাকতেও পারে।'

'কে জানবে সে কারণ!!' চিন্তিত দেখালো পুলিশ কমিশনারকে।

'ওরা জানলেও আমাদের বলবে না। আমি খোদেজাকে দিয়ে আমার কাজ শুরু করতে চাই। আমার মনে হয় সে সহজেই ভেঙে পড়বে। আর একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।'

'কি?'

'ফরহাদ খান, মণি চৌধুরীর স্বামী। ছেলেটি বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে। হয়তো সে কোনো কিছু লক্ষ্য করেছে। এবং কিছু একটা ভাবছে। আমাকে যদিও নাক

গলাতে দিতে চাইবে না। তবু দেখি, তার ভাবনার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র ঘটানো যায় কিনা।'

'টিনা, চলো একটু খোলা বাতাসে হেঁটে আসি।'

'বাতাসে? এই ঠাণ্ডার মধ্যে?' অবাক চোখে মাসুদের দিকে তাকালো টিনা।

'আমি জানি তুমি খোলা বাতাস পছন্দ করো না। সেজন্যে লাইব্রেরীর বন্ধ ঘরে বেশ থাকতে পারো।'

টিনা মৃদু হাসলো, 'শীতকালে বন্ধ ঘরের গরমে থাকতে ভালোই লাগে।'

'সেখানে তুমি বসে থাকো সারাদিন, ঠিক যেন আগুনের সামনে গুটিয়ে বসে থাকা বিড়ালের বাচ্চা। চলো, পুলিশ আর খুন-জখম ভুলে ফুসফুসে একটু বাতাস লাগিয়ে আসি।' টিনা উঠলো। ওর চলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। হল ঘর থেকে কোটটা তুলে নিয়ে সে এগিয়ে গেলো।

'তুমি গরম কিছু গায়ে দেবে না, মাসুদ?'

'নাহ্। আমার ঠাণ্ডা লাগে না।'

'আমার শীত বোধহয় একটু বেশিই। হাঁটতে হাঁটতে বললো টিনা, 'যদি এমন কোথাও যেতে পারতাম—না শীত, না গরম; সারাটা বছর।'

'আমি মধ্যপ্রাচ্যে একটা চাকরি পেয়েছি। তেল কোম্পানীতে।'

'যাচ্ছো?'

'বোধহয় না। কি হবে গিয়ে ?' ওরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

'চমৎকার, না ?'

'কি জানি। হয়তো।' আগ্রহহীন কণ্ঠে বললো টিনা।

মাসুদ সস্নেহে বললো, 'কখনো জানোনি তুমি ?'

'তুমিও কি এ সৌন্দর্য কখনো উপভোগ করেছো, মাসুদ ? তুমি তো সবসময় এখান থেকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত থেকেছো।'

'এটা আমার জায়গা নয়।'

'কোন্‌টা তোমার জায়গা, বলতে পারো ?'

'সত্যি বলতে কি, কোনটাই নয়।'

'চলো বসি!' টিনা মাসুদের হাতটা ছুঁয়ে বললো। মাসুদ বাধ্য ছেলের মতো ওর পাশে ঘাসের উপর বসে পড়লো।

'তুমি সবসময় এতো অসুখী কেন, মাসুদ ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'নিশ্চয় বুঝবো। তুমি তাঁকে ভুলতে পারো না কেন ?'

'কাকে ? কার কথা বলছো ?'

'তোমার মা।'

তিক্ত কণ্ঠে মাসুদ বললো, 'কেমন করে ভুলবো ? কেউ ভুলতে দিচ্ছে ?'

'আমি এঁর কথা বলছি না। তোমার নিজের মায়ের কথা বলছি।'

'তাকে মনে করবো কেন ? আমি তো ছ'বছর বয়সের পর থেকে তাকে দেখিনি।'

'কিন্তু তুমি সারাক্ষণ তাঁর কথাই ভাবো।'

'তোমাকে কখনো বলেছি?'

'সবসময় কি বলতে হয়?'

'তুমি এতো লক্ষ্মী কেন, টিনা?' মাসুদ টিনার কাঁধ জড়িয়ে ধরলো। টিনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। মাসুদ বললো, 'আমরা সবাই তাঁকে অপছন্দ করতাম। শুধু তুমি ছাড়া।'

'তোমরা অন্যায় করেছো। তিনি তোমাদের আশ্রয়, অন্ন, বস্ত্র, আরাম সব-ই দিয়েছেন।'

'এগুলোই কি জীবনে সব?'

'সব না হলেও অনেকখানি। তোমাদের অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়।'

'টিনা, তুমি বুঝতে পারছো না। মানুষ চাইলেই কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারে না। শৃঙ্খলের মতো মনে হয়। আমি তো এখানে আসতে চাইনি। এসব বিলাসী জীবন চাইনি। আমি আমার নিজের ঘরে নিজের পরিবেশে থাকতে চেয়েছিলাম।'

'সেখানে হয়তো না খেয়ে মরতে হতো তোমাকে।'

'সে-ও ভালো ছিলো। আমি আমার নিজের জায়গায়, নিজের লোকজনের সঙ্গে বাঁচতাম অথবা মরতাম। টিনা, তুমি বড় বেশি বৈষয়িক।'

'হয়তো এক অর্থে সত্যি। হয়তো তাই, আমি তোমাদের মতো, বিশেষ করে তোমার মতো তাঁকে অপছন্দ করি না। আমি বিশেষ কেউ হতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তাই হতে সাহায্য করেছেন। সেজন্যে আমি মাকে ভালবাসি।'

'তোমার নিজের মায়ের কথা ভাবো না ?'

'কেমন করে ভাববো ? আমি তো মাত্র তিনবছর বয়সে এখানে এসেছি। রাহেলা চৌধুরী আমার মা। এটাই আমার বাড়ি।'

'কতো সহজে তুমি মেনে নিয়েছো, টিনা !'

'তোমার কাছে কেন কঠিন, মাসুদ ? এটা তো তোমার ভুল ধারণা। রাহেলা চৌধুরীকে নয়, তুমি আসলে তোমার নিজের মাকে ঘৃণা করো। তুমি যদি তাঁকে খুন করে থাকো, হয়তো করেছো—কিন্তু আসলে তাঁকে নয়, তুমি তোমার নিজের মাকে খুন করতে চেয়েছিলে।'

'টিনা কি বলছো পাগলের মতো ?'

টিনা থামলো না। শান্তভাবে বলে চললো, 'এখন তোমার ঘৃণার পাত্রী নেই। এখন কি তোমার একা লাগে না।' নিঃসঙ্গ লাগে না, মাসুদ ?'

'তুমি কেন বললে আমি খুন করতে পারি ! আমি তো এখানে ছিলামই না।'

'সত্যিই কি তাই ?' টিনা উঠতেই মাসুদ পাশে এসে দাঁড়ালো।

'তুমি কি বলতে চাও, টিনা।' টিনা বেশ কিছু দূরে আরো দু'জনকে দেখিয়ে বললো, 'ওদের চিনতে পারছো ?'

'হ্যাঁ, হাসি আর তার ডাক্তার প্রেমিক। টিনা, অতো ধারে দাঁড়িও না।'

'কেন—ধাক্কা দেবে ? সেটা অবশ্য সহজ। আমি তো ছোট-

খাটো।'

'দোহাই লাগে টিনা, স্পষ্ট করে বলো কি বলতে চাও তুমি।' মাসুদের কণ্ঠ কর্কশ শোনালো।

টিনা জবাব না দিয়ে ফিরে হাঁটতে শুরু করলো।

'টিনা!'

টিনা মৃদু কোমল স্বরে বললো, 'হাসি আর মামুনের জন্যে চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'বাদ দাও ওদের কথা।'

'উঁহুঁ। বেচারী হাসি খুব অসুখী।'

'আমরা কি এতক্ষণ হাসিদের কথা বলছিলাম?'

'আমি বলছি। ওদের কথা ভাবছি।'

'তুমি তাহলে মনে করো মা খুন হবার দিন আমি এখানে এসেছিলাম। কথাটা বিবৃতিতে কেন বলোনি?'

'কি দরকার? জাফর খুন করেছে, এটাই সবাই মেনে নিয়েছিলো।'

'এখন যখন দেখছো জাফর খুনী নয়। তখন? টিনা, বলো?'

টিনা উত্তর দিলো না। নিঃশব্দে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

নদীর পাড়ে বসে একটা ঘাসের ডগা চিবুচ্ছিলো হাসি। মামুন তার পাশে বসে বললো, 'চুপ করে বসে থাকলে তো হবে না। কথা বলতে হবে।'

'কথা বলে লাভ কি?'

'আজ সকালে কি হলো সেটা অন্তত বলো।'

'কিচ্ছু হয়নি।'

'পুলিশ এসেছিলো? তোমাদের জেরা করেছে।'

'হ্যাঁ।'

'কি কি জিজ্ঞেস করেছে?'

'যা যা জিজ্ঞেস করে। আগের মতোই। আমরা কোথায় ছিলাম, কি করেছি, মাকে শেষ কখন জীবিত দেখেছি। মামুন, প্লীজ, আমি এ ব্যাপারে আর কথা বলতেচ াই না। যা শেষ হয়ে গেছে...'

বাধা দিয়ে মামুন বললো, 'শেষ হয়নি, হাসি। সেটাই তো বলতে চাচ্ছি।'

'তুমি এসব নিয়ে এতো ঘাঁটাঘাঁটি করছো কেন? তুমি তো আর জড়িয়ে পড়োনি।' হাসি বিরক্ত হলো।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'কথা বলে আর কি সাহায্য করবে? আমি ভুলতে চাই। ভুলতে সাহায্য করো।'

'হাসি, ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তোমাকে।'

'সারা সকাল আমি তাই করেছি।'

'হাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'হয়তো।'

'তার মানে?' অবাক হলো মামুন।

'এক কথা নিয়ে এতক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করছো কেন?'

'আমাকে সব জানতেই হবে।'

'তুমি কি পুলিশ, না গোয়েন্দা ?'

'তুমিই তো তোমার মাকে শেষ জীবিত দেখেছো ?'

'হ্যাঁ। তারপরই আমি তোমার সঙ্গে বাইরে যাই।'

'তখন কি তুমি জানতে না যে, আমি তোমাকে ভালবাসি ?'

'ঠিক শিওর ছিলাম না। আমিও যে তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছি সেটাও বুঝতে পারিনি।'

'তোমার তো তোমার মাকে খুন করার কোনো কারণ নেই।'

'আমি মনে মনে ভাবতাম, মা মরে গেলে বেশ হয়। স্বপ্নও দেখতাম।'

'স্বপ্নে কি দেখতে ?'

'দেখতাম আমি মাকে গুলি করছি অথবা মাথায় আঘাত করছি।'

মামুনকে আর প্রেমিক মনে হলো না হাসির। সে যেন মুহূর্তে বদলে গিয়ে আগ্রহী চিকিৎসক হয়ে উঠেছে।

হাসি বললো, 'ওসব তো শুধু স্বপ্নই। স্বপ্নে আমি খুব হিংস্র হয়ে যাই।' তার চেহারায় অসীম যন্ত্রণা ফুটে উঠলো।

মামুন তার হাতটা তুলে নিলো নিজের হাতে, 'শোনো হাসি, আমার কাছে লুকিও না। আমাকে বিশ্বাস করো।'

'কি বলতে চাও তুমি ?' বিস্মিত হাসি জানতে চাইলো।

'আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো। তুমি যদি তাঁকে খুন করে থাকো—আমার মনে হয় সেটা তুমি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে করোনি। আমি পুলিশকে কিছু বলবো না। শুধু তুমি-আমি জানবো। প্রমাণ না পেলে ওরা

তোমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আমাকে পুরো ব্যাপারটা জানতে হবে।'

বিস্ফারিত, অপলক দৃষ্টিতে মামুনের মুখের দিকে তাকালো হাসি, 'তুমি আমার কাছে কি জানতে চাও?'

'আসল ঘটনা।'

'আমার ধারণা, তুমি ইতিমধ্যেই তা জেনে গেছো। তুমি মনে করছো আমি খুন করেছি।'

মামুন হাসির দু'বাহুতে হাত রাখলো, 'হাসি, আমি একজন ডাক্তার। আমি জানি, মানুষ সবসময় তার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী থাকে না। আমি তোমাকে সাহায্য করবো, তোমার দেখা-শোনা করবো। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি কখনো নিঃসঙ্গ বা অবহেলিত ভাববে না নিজেকে। আমাকে সত্যি কথা বলো।'

'সত্যি কথা?' ব্যঙ্গের হাসি ছুঁয়ে গেলো হাসি চৌধুরীর ঠোঁটে। উঠে দাঁড়ালো সে।

'আমি যাই। খাবার সময় হয়ে গেছে।'

'হাসি।'

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে যে, আমি খুন করিনি?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয় বিশ্বাস করবো।'

'আমার মনে হয় না তুমি বিশ্বাস করবে।'

হাসি ঘুরে দাঁড়িয়ে একরকম ছুটেই চলে গেলো। মামুন তাকে অনুসরণ করতে গিয়েও করলো না। অসহায়ের মতো বসে পড়লো আবার।

বারো

বিরক্ত হলো ফরহাদ, 'আমি এখন বাড়ি যেতে চাই না।'

'কিন্তু এখানে তো আমাদের কোনো কাজ নেই,' মণি জোর দিয়ে বললো।

'তোমার বাবা চান আমরা থাকি। তাঁর দাবা খেলার সঙ্গী দরকার। যাই বলো, তোমার বাবা কিন্তু চমৎকার দাবাড়ু।'

'বাবা দাবা খেলার সঙ্গী খুঁজে নিতে পারবেন।'

'রাস্তা থেকে ধরে এনে?'

'আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। কতো কাজ পড়ে রয়েছে। ঘর-সংসারের কি হাল কে জানে!'

'মন, তুমি গৃহলক্ষ্মী, সে আমি জানি। কিন্তু ঘর সংসারের কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ক'দিন পরে বাড়ি গেলে কিছু হবে না।'

'তুমি বুঝবে না ঘর-সংসারের ব্যাপারে। তাছাড়া আমার এখানে অসহ্য লাগছে।'

'কেন?'

'কেমন যেন মন-মরা ভাব বাসাটায়। তাছাড়া এসব খুন-টুন আমার ভালো লাগে না।'

'তাই বলে একথা বোলো না যে, তোমার ভয় করছে। আমি জানি, চোখের সামনে খুন দেখলেও তোমার মুখের কোনো শিরা কাঁপবে না। মন, আসলে তুমি যেতে চাও ঘর-কন্না করার জন্যে।'

'হ্যাঁ, তাই,' জেদি কণ্ঠে বললো মণি।

'কিন্তু আমার এখানে ভালো লাগছে।'

'নিজের বাড়ির চেয়েও?' আহত হলো মণি।

'আমি দুঃখিত। একথা বলতে চাইনি। নিজের বাড়ির চেয়ে কোনো কিছুই ভালো না। আর আমাদের সংসার তোমার হাতের ছোঁয়ায় যে কতো সুন্দর হয়ে উঠেছে তা নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। কিন্তু যদি এমন হতো, আমি সারাদিনের কাজ সেরে তোমার কাছে ঘরে ফিরতাম, তাহলে অনেক ভালো লাগতো। কিন্তু তা তো নয়। সবাই তো অন্য রকম।'

'আমি জানি। এবং সেটা ভুলি না বলেই তোমার জন্যে সব করতে চেষ্টা করি।'

ফরহাদের কণ্ঠের তিক্ততা ঢাকা পড়লো না, 'একটু বেশিই করো। আমার মাঝে মাঝে দম আটকে আসে। আমি একটু অন্যদিকে মন দিতে চাই। না, হানিমুন ব্রিজ, শব্দকল্প বা দাবা নিয়ে নয়। যেসব মানুষ সমবেদনা জানাতে আসে, তাদের নিয়েও নয়। অন্য কিছু—ইন্টারেস্টিং কিছু। এখানে আমি সেটা

পাচ্ছি।'

আচমকা মণি যেন জেগে উঠলো, 'তুমি কি এখনো ওসব ভাবছো? তোমার ওসব ধ্যান-ধারণা!'

'হ্যাঁ মন, আমি জানতে চাই কে করেছে। আমি এর শেষ দেখতে চাই।'

'কেন? না জেনেই কি আমরা ভালো নেই?'

'মন, তুমি কি বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পালাতে চাও? তোমার কি কোনো কৌতূহল নেই?'

'আমি ভুলতে চাই।'

'তুমি জানতে চাও না কে তোমার মাকে খুন করেছে?'

'না। আমরা তো জানতামই জাফর খুনী।'

'জেনে আমরা কি চমৎকার নিশ্চিত ছিলাম!' ফরহাদের কণ্ঠের ব্যঙ্গের সুর মণিকে বিভ্রান্ত করলো। মাঝে মাঝে মণি ফরহাদের কথা বুঝতে পারে না। ফরহাদই আবার স্বাভাবিক স্বরে বললো, 'মন, তুমি বুঝতে পারছো না, আমার বুদ্ধির পরীক্ষা দেবার একটা সুযোগ এসেছে? এমন নয় যে তোমার মায়ের প্রতি আমার তেমন কোনো ভালবাসা ছিলো। বরং তাঁকে আমি অপছন্দই করতাম। কারণ তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তোমার-আমার বিয়ে আটকাতে। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার আর কোনো রাগ নেই, কারণ আমি তোমাকে জয় করে নিয়েছি। না মন, কোনো প্রতিহিংসা নয় অথবা ন্যায়বিচারের জন্যে প্রতীক্ষাও নয়, নিছক কৌতূহল বলতে পারো।'

'দোহাই লাগে, বাড়ি ফিরে চলো।'

'তুমি চাইলে হয়তো যেতে হবে। কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছে নেই। কখনো কখনো আমি যা চাই, তা কি তুমিও চাইতে পারো না, মন ?'

'পৃথিবীর যা কিছু সবি আমি তোমাকে দিতে চাই।'

'না, তা তুমি চাও না। তুমি চাও আমাকে শিশুর মতো যত্নে রাখতে।'

'কিন্তু কেন তুমি জানতে চাও ? কাউকে জেলে পাঠানো কি খুব সুখের ?' মরিয়া হয়ে বললো মণি।

'জেলে তো পাঠাচ্ছি না। প্রমাণই হয়তো পাবো না।'

'তাহলে জানবে কিভাবে ?'

'কতরকম উপায় আছে। আসলে জানাটা খুব জরুরী। এ বাড়ির আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে।'

'তার মানে ?'

'তোমার বাবা ও রেহানার কথা-ই ধরো না।'

'বাবার এই বয়সে বিয়ে করার দরকারটা কি ?'

'দরকারটা আমি বুঝতে পারি, মন। তোমার বাবার এটাই শেষ সুযোগ ভালবাসা পাবার, সুখী হবার। কিন্তু জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে!'

'এসব ঘটনা…'

'হ্যাঁ, এসব ঘটনাই দায়ী। তাঁরা যে দু'জনের কাছ থেকে দু'জনে দূরে সরে যাচ্ছেন তার কারণ হয় অপরাধবোধ নয় সন্দেহ।'

'কাকে সন্দেহ ?'

'পরস্পরকে। অথবা এক পক্ষে সন্দেহ, অন্যের অপরাধ-বোধ। যেটাই তুমি ভাবো।

এতসব ভাবতে নারাজ মণি, 'তোমার কথায় আমার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে।'

মণির যে কোনো কল্পনাশক্তি নেই তা ফরহাদের অজানা নয়। আপন উৎসাহে ফরহাদ বলে গেলো, 'তুমি রেহানার জায়গায় নিজেকে ভাবো, যাকে সে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে পারছে না। আবার তোমার বাবার জায়গায় নিজেকে ভাবো, তিনি আশা করছেন রেহানা এ কাজ করেনি। ভাব-ছেন, রেহানা এ কাজ করতে পারে না। অথচ নিশ্চিত নন। এবং হয়তো কখনো তিনি সন্দেহমুক্ত হতে পারবেন না।'

'আমি বুঝি না এ বয়সে বাবার কি দরকার···'

এবার ক্ষেপে গেলো ফরহাদ, 'বয়স, বয়স কোরো না তো। বয়সের জন্যেই তো তাঁরপক্ষে ব্যাপারটা কষ্টকর। পুলিশ হয়তো তাঁকেই সন্দেহ করছে। মন, তোমার কাউকে সন্দেহ হয় না?'

'আমার আবার কাকে সন্দেহ হবে? আমার এসব ভাবতে ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না, নাকি ভুলে থাকতে চাও। আসলে তুমি জেনে শুনে সব লুকোতে চাও। তুমি হাসির কথা কিছু ভাবছো?'

'হাসি কেন মাকে খুন করতে যাবে?'

'তেমন কোনো কারণ যদিও নেই। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় অভাবনীয় কাজ করে বসে অনেকে। হাসি সেরকমই মেয়ে।'

'চুপ করো তো।'

'চুপ করবো। কিন্তু ব্যাপারটা তো জানা দরকার।'

'সেদিন তো মাত্র চারজন মানুষ বাসায় ছিলো। তোমার সঙ্গে আমিও একমত যে, বাবার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। হাসির কথাও ভাবা যায় না। বাকি থাকে বুয়া আর রেহানা।'

'এদের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ খুনী হিসেবে?' ফরহাদের কণ্ঠে ঠাট্টার সুর।

মণি সেটা ধরতে পারলো না, 'বুয়া মায়ের বাধ্য ছিলো। যদিও মানুষ অনেক সময় অদ্ভুত আচরণ করে। কিন্তু বুয়াকে সেরকম কখনো মনে হয়নি।'

'ঠিক বলেছো। বুয়া খুব স্বাভাবিক মহিলা। এসব মহিলারা ভালো গিন্নী হয়। কিছুটা রেহানার মতোই। রেহানা সুন্দরী, অল্প-বয়সী। বুয়া তা নয়। খুবই সাধারণ চেহারা এবং বুদ্ধিও সাধারণ। বেচারী কোনো পুরুষকে কখনো পটাতেও পারেনি।'

বিরক্ত হলো মণি, 'তোমার ধারণা বিয়েটাই মেয়েদের জীবনে সব।'

'সব না হলেও মেয়েরা বিয়েতে প্রাধান্য দেয় এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আচ্ছা, টিনার কোনো ছেলে বন্ধু নেই?'

'আমি ঠিক জানি না। ও তো আবার নিজের সম্পর্কে কিছুই বলে না।'

'হ্যাঁ, বড্ড শান্ত, মুখচোরা। মনে হয় ও কিছু জানে।'

'কতো কি যে কল্পনা করো তুমি।'

'কল্পনা নয়। মনে আছে ও কি বলেছিলো, 'আমি আর

কিছু জানতে চাই না।' কথাটার অর্থ কি ?'

চিন্তায় ডুবে গেলো ফরহাদ। মণি এসে ওর চুলে হাত রাখলো, 'শোনো।'

মাথা নাড়লো ফরহাদ, 'না মন, আমাকে কিছু একটা করতে দাও।'

'ওহ্!' ব্যাকুল শোনালো তার কণ্ঠ, 'কতো সুখী ছিলাম আমরা। সবকিছু কতো সুন্দরভাবে চলছিলো। এখানে— আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

সচেতন হলো ফরহাদ, 'মন, তোমার কি খুবই অসহ্য লাগছে ? আমি দুঃখিত।'

আশার আলো জ্বলে উঠলো মণির চোখে, 'তাহলে তুমি বাড়ি ফিরে যাবে ? এসব ভুলে যাবে ?'

'ভুলতে আমি পারবো না। ঠিক আছে, এ সপ্তাহটা থাকি। তারপর দেখা যাবে।'

তেরো

'বাবা, আমি আরো কয়েকটা দিন থাকতে চাই,' মাসুদ বললো।

'নিশ্চয় থাকবে। তোমরা কাছে থাকলে তো আমার ভালো

লাগে। তোমার কারখানায় অসুবিধে হবে না তো?' বললেন আনিস চৌধুরী।

'না, খবর দিয়েছি। টিনাও এ সপ্তাহটা আছে।'

মাসুদ দুই পকেটে হাত রেখে একবার জানালার কাছে, একবার বইয়ের শেল্‌ফের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে বললো, 'বাবা, তোমরা অনেক করেছো আমার জন্যে। আমি—মানে আমি খুবই অকৃতজ্ঞ ছিলাম এতদিন। মুখটা সামান্য লাল হলো মাসুদের।

'কৃতজ্ঞতার কিছু নেই মাসুদ। তুমি আমার ছেলে। আমি তোমাকে সেভাবেই দেখি।'

'কিন্তু তুমি আমাকে কখনো ছেলের মতো শাসন করোনি।'

'সন্তানকে শাসন করাই কি বাপের একমাত্র কর্তব্য?' সস্নেহ হাসি দেখা দিলো আনিস চৌধুরীর মুখে।

'তা নয়। আসলে আমি একটা আহাম্মক ছিলাম। বাবা, আমি একটা তেল কোম্পানীতে চাকরি পেয়েছি। মা-ও তাই চেয়েছিলেন। অথচ আমি তখন উল্টোটা করেছিলাম।'

'তুমি তো সবসময় তাই করেছো, মাসুদ। তুমি নিজের পছন্দে সব করতে চাইতে। আমাদের চাপিয়ে দেয়াটায় তোমার প্রবল আপত্তি ছিলো। আমরা যদি লাল শার্ট কিনে দিতে চাইতাম, তুমি নীলটার জন্যে জেদ ধরতে। অথচ মনে মনে হয়তো তোমার লালটাই পছন্দ ছিলো।'

লাজুক হাসির সঙ্গে স্বীকার করলো মাসুদ, 'আমি খুব জ্বালিয়েছি।'

'জ্বালানো নয়, একটা বয়সে অমন হয়। আবার সব ঠিক হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আমার খুব ভালো লাগছে তুমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছো বলে। তুমি যেটা করছো সেটাও খারাপ নয়। তবে ওটা তোমাকে কোনো গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারতো না।' আনিস চৌধুরী গোঁয়ার ছেলে মাসুদের মুখের দিকে তাকালেন, 'মাসুদ, তুমি জানো, ট্রাস্টে তোমার জন্যে টাকা রাখা আছে। তুমি কোনো ব্যবসা করতে চাইলে কিন্তু করতে পারো।'

'ধন্যবাদ, বাবা, কিন্তু আমি আর বোঝা বাড়াতে চাই না।'

'বোঝা নয়, মাসুদ। ও টাকা তোমার।'

'ও টাকা মায়ের।'

'ট্রাস্ট কিন্তু বহুবছর আগেই হয়েছে।'

'ও টাকা আমি নিতে চাই না, ছুঁতেও চাই না।' জোর দিয়ে বলে ফেলে লজ্জিত হলো মাসুদ, 'বাবা, আমি দুঃখিত। আমি এভাবে বলতে চাইনি।'

'কেন ছুঁতে পারবে না মাসুদ, তোমাকে তো আমরা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছি। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সহ তোমার সব দায়িত্বই আমাদের উপর ছিলো।'

'আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।'

'তা ভালো। তবে যদি মত বদলাও, জেনো তোমার টাকা তোমারই আছে।'

'বাবা, আমার কথা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি জেনে

ভালো লাগছে। আমার নিজের পথে আমি চলতে চাই।'

দরজায় টোকা শোনা গেলো। আনিস চৌধুরী বললেন, 'বোধহয় ফরহাদ। মাসুদ, দরজাটা খুলে দাও তো, বাবা।' মাসুদ দরজা খুললে হুইল চেয়ার চালিয়ে ঘরে ঢুকলো ফরহাদ।

'আপনারা বোধহয় ব্যস্ত। আমি তাহলে পরে আসি।'

মাসুদ বললো, 'বাবা, আমি যাই। টিনাকে সঙ্গে করে একটু ঘুরে আসি। মেয়েটা বড্ড ঘরকুনো।'

মাসুদ বেরিয়ে গেলে ফরহাদ বললো, 'মাসুদের কিছুটা পরিবর্তন দেখছি মনে হয়।'

'বড় হচ্ছে। বুদ্ধি হচ্ছে।'

'রেহানা আসেনি?'

'আজ আসবে না। অসুস্থ বলে খবর পাঠিয়েছে।'

ফরহাদ চিন্তিতভাবে বললো, 'মাসুদকে কি আপনার বিবেকবান মনে হয়?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন।'

'এমন মানুষও আছে যার অপরাধবোধ বা অনুশোচনা নেই। জাফরও সেরকম ছিলো।'

'হ্যাঁ, জাফরের এসব ছিলো না।'

'আপনি কি কিছু মনে করবেন, যদি আমি ব্যক্তিগত কয়েকটি প্রশ্ন করি?'

'অবশ্যই না। কি জানতে চাও?'

'আপনার দত্তক সন্তানদের বংশগতি সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'কেন জানতে চাও, ফরহাদ ?'

'কৌতূহল।'

আনিস চৌধুরী কোনো কথা বললেন না। ফরহাদ একটু ইতস্তত করলো, 'আপনি কি বিরক্ত হলেন ?'

'না, ফরহাদ। তুমিও এ পরিবারের একজন সদস্য। জানবার অধিকার তোমার নিশ্চয় আছে। কখনো কখনো এসব প্রশ্ন করার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।' একটু থেমে আনিস চৌধুরী বললেন, 'একমাত্র মণিকে ছাড়া আমরা ঠিক প্রচলিত পদ্ধতিতে কাউকে দত্তক নিইনি। জাফর এতিম ছিলো, তার বৃদ্ধা নানী তাকে আমাদের হাতে তুলে দেয়। মাসুদ ও হাসির বাবার পরিচয় কারো জানা নেই। মাসুদের মা তাকে বিক্রি করে দেয়। হাসির মা সম্ভবত নার্স ছিলো। টিনার বাবা মা আমাদের চোখের সামনে সাপের কামড়ে মারা যায়।'

'তার মানে সব ক'জনই সমান দুর্ভাগা।'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই রাহেলা এদের প্রতি সাজ্ঘাতিক মমতা অনুভব করেছিলেন। এদের ঘর ও মাতৃস্নেহ দিতে চেয়েছিলেন।'

'তিনি যা করেছেন তা অত্যন্ত মহৎ কাজ।'

'কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। রাহেলা ভেবেছিলেন রক্তের সম্পর্ক বলে কোনো ব্যাপার নেই। আসলে তা নয়। নিজের সন্তানদের প্রতি যে বোধ, যে অনুভূতির প্রকাশ থাকে তার কোনো তুলনা নেই। দত্তক সন্তানদের আমরা নিজের চিন্তা, নিজের বোধ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। তাদের মনের

ভেতর কি আছে, আমরা সহজভাবে তা বুঝতে পারি না। হতে পারে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবারের বলে।'

'আপনি বোধহয় এটা শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন?'

'আমি রাহেলাকে সতর্ক করেছিলাম। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদের নিজের সন্তান বলে তিনি ভাবতে চাইতেন।'

ফরহাদ বললো, 'টিনা এতো কম কথা বলে যে ওর মনের মধ্যে কি আছে বোঝা মুশকিল। সে এই ব্যাপারে কিছু জানে অথচ বলছে না।'

আনিস চৌধুরী কাগজ উল্টে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাত থেমে গেলো। একমুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে বললেন, 'টিনা কিছু জানে তোমাকে কে বললো?'

'বোঝা যায়, নিশ্চয়ই ও এমন কিছু জানে যা কারো জন্যে খুবই বিপদজনক।'

'ফরহাদ, এ ধরনের ধারণা বা সিদ্ধান্তে আসাটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'আপনি কি আমাকে সাবধান করে দিচ্ছেন?'

'এটা কি তোমার মাথা ঘামাবার বিষয়?'

'আমি পুলিশের লোক নই বলে?'

'হ্যাঁ, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করা পুলিশের কাজ।'

'আপনি সত্য জানতে চান না?'

'হয়তো।' বললেন আনিস চৌধুরী, 'আসলে ভয়ই হচ্ছে আমার। কে জানে কি জানতে হবে!'

ফরহাদ হুইল চেয়ারের হাতল চেপে ধরে, নরম সুরে বললো, 'হয়তো আপনি জানেন কে একাজ করেছে।'

'না।' হঠাৎ করে আনিস চৌধুরীর শান্ত, আত্মকেন্দ্রিক ভাব বদলে গেলো। ঋজু ভঙ্গিতে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, 'না, আমি জানি না। বুঝেছো? আমি জানি না এবং জানতে চাইও না।'

চোদ্দ

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো হাসি। হুইল চেয়ার চালিয়ে কখন যে ফরহাদ পেছনে এসে হাজির হয়েছে, টের পায়নি সে।

'কি করছো, হাসি সোনামণি।' চমকে ঘুরে দাঁড়ালো হাসি, 'ওহ্ আপনি?'

'দৃশ্য উপভোগ করছিলে, না আত্মহত্যার কথা ভাবছিলে?'

'তার মানে?' স্পষ্টতই চটে গেলো হাসি।

'না, বলছিলাম কি, আত্মহত্যা করার জন্যে জানালাটা তেমন সুবিধাজনক নয়। ভাবো দেখি, মরতে পারলে না, শুধু হাত পা

ভেঙে পড়ে রইলে !'

ঠাট্টার জবাব না দিয়ে হাসি বললো, 'মাসুদ এই জানালা দিয়ে পেয়ারা গাছ বেয়ে ওঠা-নামা করতো। মা টেরও পেতেন না।'

প্রসঙ্গ বদলে আবার আকস্মিকভাবে বললো, 'আপনারা যে আছেন, সেজন্যে আমার খুব ভালো লাগছে। আপনি নিশ্চয় কথা বলতে বিরক্ত হন্ না।'

'আজকাল আমার তো কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আমার ঘরে চলো। অনেক কথা বলা যাবে।' হাসিকে ইতস্তত করতে দেখে ফরহাদ বললো, 'চিন্তা কোরো না। মণি নিচে গেছে, আমার জন্যে স্বহস্তে সুখাদ্য রাঁধতে।'

'মণি এসব কথা বুঝবে না।'

ফরহাদ সায় দিলো, 'হ্যাঁ, মণি এসবের কিছুই বুঝবে না।'

ফরহাদের হুইল চেয়ারের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসি বললো, 'আপনি কি করে এতো বোঝেন ?'

ঘরে ঢুকে হুইল চেয়ারটাকে হাসির মুখোমুখি ঘুরিয়ে ফরহাদ বললো, 'কি হয়েছে আমাকে বলো, হাসি। ঝগড়া হয়েছে তোমার ডাক্তারের সঙ্গে ?'

'ঝগড়া না। তারচেয়েও খারাপ।'

সান্ত্বনার সুরে বললো ফরহাদ, 'ঠিক হয়ে যাবে।'

'না।' সজোরে মাথা নাড়লো হাসি, 'হবে না। আমি পারবো না।'

'এমন চরমপন্থীর মতো কথা বলতে নেই, হাসি।'

'আমি বরাবরই এরকম। যা-ই করতে চাই না কেন, কিছু না কিছু গোলমাল হবেই। আসলে আমি ভীষণ অপয়া। সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকেই আত্মহত্যার কথা ভেবে আসছি।'

'চোদ্দ থেকে উনিশ—এ বয়সেই ছেলে-মেয়েরা মরার কথা ভাবে। এ বয়সেই মনে হয়, তারা যা করতে চাইছে, তা করতে দেয়া হচ্ছে না। এই বয়সে পৃথিবীকে রঙিন মনে হয়। তখন সামান্য স্বপ্নভঙ্গ সহ্য হতে চায় না। তোমার সে সময়টা এখনো পার হয়নি, হাসি।'

'সবসময় মা যা বলেছেন, ঠিক হয়েছে। আমি আজীবন ভুল করেই এসেছি। অভিনয় না জেনেও সে চেষ্টা করেছি। প্রেম করেছি বয়স্ক এক বিবাহিত লোকের সঙ্গে। সে বলেছিলো দাম্পত্য জীবনে সে অসুখী।'

'বাস্তবে দেখা গেলো, সবই মিথ্যা। আসলে সে তোমাকে এক্সপ্লয়েট করেছিলো।'

'হ্যাঁ। আপনি কি মজা পাচ্ছেন?'

'না, হাসি,' শান্তভাবে বললো ফরহাদ, 'আমি বুঝতে পারছি সে সময়টা তোমার খুব খারাপ গেছে।

'আমি একটা আহাম্মক ছিলাম। বোকা আর সস্তা একটা মেয়ে!' হাসির কণ্ঠে তিক্ততা।

'কখনো কখনো ঠেকে শিখতে হয়। কোনটাই তোমার ক্ষতি করেনি। হয়তো বা তোমাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।'

'সবসময় আমি ভুল পন্থায় বিদ্রোহ করতে চেয়েছি। এবং করেওছি। পরে অনুতাপ হয়েছে।'

'আসলে তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে।'

'হ্যাঁ, তার কারণ আমি দত্তক সন্তান। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত যেটা আমি জানতামই না। ভাবতাম, আমি ছাড়া অন্য সবাই দত্তক। জানার পর এতো বিচ্ছিরি লাগলো, মনে হলো কোথাও আমার কোনো জায়গা নেই।'

সস্নেহে বললো ফরহাদ, 'নাটকীয় ভাব তোমার গেলো না!'

'ঐ মহিলা আমার মা নন। আমি কি ভেবেছি, কি অনুভব করেছি, কিসে কষ্ট পেয়েছি, কিছুই তিনি বোঝেননি। সবসময় আমার জীবনের ছক কাটতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে ঘৃণা করতাম।'

'হাসি!'

'আমার সবকিছু অসহ্য লাগছে। আমি কি করবো? উহ! আমার যে কি হবে!'

'সুদর্শন ডাক্তারকে বিয়ে করে ফেলো।'

'সে আমাকে বিয়ে করতে চায় না।'

'তুমি ঠিক জানো? সে বলেছে, না তুমি ভাবছো?'

'তার ধারণা আমি মাকে খুন করেছি।'

'সত্যি করেছো নাকি?'

'কেন আপনি একথা বললেন?' শক্ত, কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করলো হাসি, 'করলেও কি আপনাকে বলবো?'

'জানতে পেলে মন্দ হতো না। অবশ্য না বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ।'

'মামুন বলেছে, ওর ধারণা আমি খুন করেছি। আমি স্বীকার

করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে ও বিয়ে করে সুখে রাখবে। ওটা আমাদের কোনো মাথাব্যথার কারণ হবে না।'

'বেশ, বেশ।'

'ওকে বলে কি লাভ যে, আমি খুন করিনি। ও কি বিশ্বাস করবে?'

'করতেও পারে।'

'বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি! করিনি! করিনি! আমরা কেউ সত্য জানি না। সবাই সবাইকে সন্দেহ করছি। মণি ভাবছে আমি করেছি। বুয়া এতো নিশ্চিত যে আমাকে আগলে রাখছে। আমার কোনো আশা নেই। আমার উচিত নদীতে ঝাঁপ দেয়া।'

'হাসি, পাগলামি কোরো না।'

'তাহলে আমি কি করবো? কিভাবে বাঁচবো? আপনি ভাবছেন আমি পাগল, ভারসাম্যহীন।'

'হাসি, বোকা মেয়ে।' হাসির বাহু ধরে তাকে কাছে টানলো ফরহাদ। হাসি টাল সামলাতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ফরহাদ ওর গালে চুমু দিলো।

'তোমার একজন স্বামীর দরকার। অবশ্য ঐ ডাক্তারটার মতো নয়, যার মাথায় মনস্তত্ত্ব আর চিকিৎসাবিজ্ঞান গিজ গিজ করছে। তুমি বোকা হলেও একটা মিষ্টি মেয়ে।' দরজা খুলে গেলো। চিত্রার্পিতের মতো মণি সেখানে দাঁড়ানো। হাসি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। ফরহাদকে সামান্য ফ্যাকাসে দেখালো, 'আমি হাসিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম।'

'ওহ!' মণি ধীরপায়ে ঘরে ঢুকলো। হাতের ট্রেটা ছোট টেবিলে বসিয়ে ফরহাদের সামনে এনে রাখলো। হাসির দিকে একবারও তাকালো না। হাসি ইতস্তত করে বললো, 'আমি তাহলে যাই···' কি করবে বুঝতে না পেরে সে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিলো।

'হাসি আত্মহত্যার কথা ভাবছিলো। আমি ওকে বোঝাচ্ছিলাম,' বললো ফরহাদ। মণি কোনো কথা বললো না। ফরহাদ মণির দিকে হাত বাড়ালো। মণি সরে গেলো।

'মন, তুমি কি রাগ করেছো?' এবারও মণি নিরুত্তর।

'কেন? আমি ওকে চুমু দিয়েছি বলে'? ওকে এতো বোকা আর ছেলেমানুষ লাগছিলো। আমার হঠাৎ মনে হলো···' ফরহাদ কোমল স্বরে বললো, 'মন,কাছে এসো, লক্ষ্মীটি!'

মণি শীতল কণ্ঠে বললো, 'স্যুপটা না খেলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' বেরিয়ে যাবার সময় সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে গেলো মণি।

পনেরো

ডঃ কায়সার লিখছিলেন। সমস্ত ডেস্কে বই ও কাগজপত্র ছড়ানো। ফোন বাজলো। রিসেপশন থেকে জানাচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন একজন অল্পবয়সী মহিলা। অবাক হলেন ডঃ কায়সার, কে হতে পারে! রিসেপশনিস্ট কণ্ঠ নামিয়ে বললো, 'স্যার, একজন সুন্দরী তরুণী!' বিব্রত ডঃ কায়সার তাকে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

বেল বাজলে দরজা খুলে তিনি বিস্মিত হলেন। হাসি চৌধুরী!

'আপনি? আসুন, আসুন।'

ডঃ কায়সার ভাবলেন মেয়েটি ফ্যাশন সম্পর্কে উৎসাহী নয় কেন। শাড়িটা কোনরকমে পরা, একটা হাতখোঁপা করা, আভরণহীন। দেশে ফিরে তিনি দেখেছেন এই বয়সী মেয়েরা কতো রকম সাজসজ্জা করে। হাসিকে দেখে মনে হলো সে হাঁফাচ্ছে।

'আপনি আমাকে সাহায্য করুন। প্লীজ!' হাসির কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

একটা চেয়ার টেনে ডঃ কায়সার বললেন, 'আপনি বসুন। শান্ত হোন। তারপর বলুন কি হয়েছে। আমার সাধ্যমতো নিশ্চয় সাহায্য করবো।'

হাসি বসলো।

'আমি জানি না কি করবো। কার কাছে যাবো। শেষ পর্যন্ত আপনার কাছেই এলাম। কারণ আপনিই এসব জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।'

'আপনার সমস্যাটা কি খুলে বলুন।' ডঃ কায়সার আর একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

'আমরা সবাই সমস্যায় আছি। কিন্তু মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর বলে আমি শুধু নিজের কথাই ভাবছি।'

ডঃ কায়সার বললেন, 'আপনাকে কিছু দিই। চা, কফি, অথবা ঠাণ্ডা কিছু?'

হাসি মাথা নাড়লো, 'না, কিচ্ছু না।'

ডঃ কায়সার বললেন, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কফি খেলে ভালো লাগবে।'

রুম সার্ভিসে তিনি স্যাণ্ডুইচ ও কফির অর্ডার দিয়ে আবার এসে বসলেন

'মিস চৌধুরী, এতো ঘাবড়াবেন না। সবসময় মনে হয় সমস্যার বুঝি কোনো সমাধান নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঠিকই সমাধান বেরিয়ে আসে।'

'জানি না। সবই তো ঠিকঠাক চলছিলো। আপনি এসে সব গোলমাল করে দিলেন।'

ডঃ কায়সার বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'প্রথমদিন আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি, আমার আনা তথ্য আপনাদের জীবনকে কিভাবে ওলোট-পালোট করে দিয়েছে।'

'এতদিন আমরা ভেবেছিলাম জাফরই···' হাসি থেমে গেলো।

'জানি। কিন্তু সত্য যতো রূঢ়ই হোক, তার দিক থেকে মুখ ফেরানো যায় না।'

'আপনি সাহসী তাই সত্য স্বীকার করতে আপনার বাধেনি। যাঁরা সাহসী আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কারণ আমার নিজের একটুও সাহস নেই।'

'আপনার কি হয়েছে?'

'আপনি বোধহয় জানেন—মানে একজন ডাক্তার। আমার বন্ধু!'

ডঃ কায়সার হাসির ইতস্তত ভাব দেখে কথা ধরিয়ে দিলেন, 'বন্ধুর চেয়ে বেশি।'

'হ্যাঁ। অন্তত আমি তাই ভাবতাম। হয়তো সে-ও। কিন্তু এখন···'

'এখন?'

'মামুন ভাবছে আমি খুন করেছি। সরাসরি প্রকাশ না করলেও আমি যে করিনি সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। ও বোধহয় ভাবছে আমার সম্ভাবনাই সবচে বেশি। এ রকম সন্দেহ অবশ্য আমরা সবাই সবাইকে করছি।'

কফি ও স্যাণ্ডুইচ দিয়ে গেলো। ডঃ কায়সার নিজ হাতে

কফি ঢেলে দুধ-চিনি মিশিয়ে কাপটা হাসির সামনে রাখলেন। হাসি স্যাণ্ডুইচের দিকে হাত বাড়ালো। ওর হাত কাঁপছে। কোনরকমে একটা স্যাণ্ডুইচ শেষ করে ঢক ঢক করে পানি খেলো সে। ডঃ কায়সার মেয়েটার জন্যে মমতা অনুভব করলেন। কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে আবার কথা বললো হাসি, 'আমার কারো সাহায্যের দরকার। আপনার কথা ভাবলাম একটা স্বপ্নের কারণে। আমি সেদিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম···' হাসি অনেকটা স্বপ্নালু কণ্ঠে বলে গেলো, 'দেখলাম, মামুন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। সামনে একটা বিরাট খাদ। না, খাদ নয়,' মাথা নাড়লো হাসি, 'গহ্বর! গহ্বর বললে খুব গভীর শোনায়, না? আপনি তার অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে যেন বলছেন, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। সেদিনের সেই স্বপ্নের কথা ভেবেই আমি আপনার কাছে চলে এলাম।' বুক ভরে যেন শ্বাস নিলো হাসি, 'আপনি অবশ্য বলে দিতে পারেন এ ব্যাপারে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই।'

'না। অবশ্যই আছে। আমি জানি, যে কাজ আমি শুরু করেছি, তা আমাকেই শেষ করতে হবে।'

'ওহ্!' চকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হাসির মুখ। সুন্দর দেখালো তাকে, 'আমি তাহলে একা নই।'

'মোটেই না। আমি আছি পাশে। কখনো কারো কোনো সাহায্যে আসার সুযোগ হয়নি। কিন্তু যে কাজই করি, তা আমি সাধারণত নিষ্ঠার সঙ্গে করি।'

কফি শেষ করে কাপটা রেখে আঁচলেই মুখ মুছলো হাসি।

ডঃ কায়সার বললেন, 'ছেলেটির নাম কি?'

'মামুন হায়দার। ডাক্তার।'

'সে কি সত্যি মনে করে তুমি খুন করেছো?'

'ওর আশঙ্কা তাই।' হঠাৎ কি যেন মনে হতেই ডঃ কায়সারের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসি বললো, 'আপনিও হয়তো তাই ভাবেন।'

'না তো। আমি তো জানি তুমি নির্দোষ।'

'এমনভাবে বললেন যেন সত্যিই আপনি জানেন।'

'আমি সত্যিই জানি।'

'কেমন করে?'

'যেদিন সব ঘটনা বলে তোমাদের বাড়ি থেকে আমি চলে আসছিলাম, তখন তুমি কি বলেছিলে মনে পড়ে? নির্দোষ যারা, তাদের কি হবে? এই নিয়ে তুমি চিন্তিত হয়েছিলে। নিজে নির্দোষ না হলে ও কথা তুমি বলতে পারতে না।'

'সত্যি বলছেন? আপনি বিশ্বাস করেন যে আমি খুন করিনি?' বুকের উপর থেকে যেন পাথর নেমে গেলো হাসির।

'তাহলে এবার আমরা ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারি, কেমন?' বললেন ডঃ কায়সার, 'আমি তোমার নির্দোষিতায় বিশ্বাস করি, কথাটা মনে রেখে বলো, কেন তোমাকে খুনী ভাবা যেতে পারে?'

'আমি খুন করার কথা মাঝে মাঝে ভেবেছি। দু'এক সময় রাগে অস্থির হয়ে গিয়েছি। মা খুব শান্ত থেকে সবকিছুর উপর

কর্তৃত্ব করতেন। আমার তখন মাকে খুন করার ইচ্ছা জাগতো। আপনার যখন বয়স কম ছিলো, তখন কি রেগে গেলে আপনার এমন মনে হয়নি?'

আচমকা ধাক্কা লাগলো ডঃ কায়সারের বুকে। মাসুদও তার বয়স নিয়ে কথা উঠিয়েছিলো। হাসিরও কি মনে হয় তার কম বয়সটা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে? শৈশবকে মনে পড়লো তার—তারা দু'টি ছেলে একবার এক শিক্ষকের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে খুন করার কথা ভেবেছিলো। কিন্তু করেনি।

'মা যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন, আমি আরেকটু বড় হতাম, বুঝতে শিখতাম—তাহলে হয়তো তাঁরসঙ্গে বন্ধুত্ব হতো। আমি তাঁর সাহায্য আর পরামর্শে খুশি হতে পারতাম। কিন্তু হয়েছিলো ঠিক উল্টোটা। এতো আহাম্মক ছিলাম যে রাগ সামলাতে পারতাম না। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করতো? এখন কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'মায়ের প্রতি খুব অবিচার করা হয়েছে। তিনি যা দিয়েছেন, বিনিময়ে কিছুই পাননি। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এসব কথা বলে আর কি লাভ। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আমি বোকামি আর ছেলেমানুষী কাটিয়ে উঠে বড় হবার চেষ্টা করতে পারবো।'

'আমি তো বলেছি, তোমাকে সাধ্যমতো সাহায্য করবো।'

'এখন আমরা সবাই সবাইকে সন্দেহ করছি। খোদেজা বুয়া

বার বার বলছে, কাউকে বিশ্বাস না করতে। এমন কি তাকেও না। সবাই আমরা এতো যন্ত্রণা ভোগ করছি!'

'আমি বুঝতে পারছি,' সমবেদনার সুরে বললেন ডঃ কায়সার।

'মাসুদ মাকে ঘৃণা করতো, সবসময়! টিনা মনে হয় ভালবাসতো। রেহানা অপছন্দ করতো। খোদেজা বুয়া অনুগত ছিলো, তবে সবসময় মায়ের সব ব্যাপারে একমত হতো না। বাবা···' থেমে গেলো হাসি।

সাগ্রহে জানতে চাইলেন ডঃ কায়সার, 'হ্যাঁ?'

'মা মারা যাবার পরে বাবাকে জীবন্ত মনে হয়েছে। অন্তত আগের মতো নিরাসক্ত আর মনে হয় না। কিন্তু বাবা তো ভালবেসেই মাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা কখনো ঝগড়া করতেন না। কিন্তু জানি না বাকি সবার মনে কি আছে। ওহ্, ডঃ কায়সার, এসব ভাবলেই আমার ভয় করে!'

তার কাঁধে হাত রেখে ডঃ কায়সার কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি তো আর ছোট্টটি নও, হাসি। ছোটরাই ভয় পায়। এখন বড় হয়েছো। তুমি এখন একজন মহিলা।' হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এই শহরে তোমার কোনো থাকার জায়গা আছে?'

'আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় উঠেছি।'

'তুমি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো সেখানে চলে যাবে। সন্ধ্যায় আমি তোমাকে নিয়ে বাইরে খাবো। রাজি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্যে থাকতে পারবো না!' অসহিষ্ণু ভাবে বললো হাসি।

'তোমার দিগন্ত দেখছি অনির্দিষ্টকাল দিয়ে বাঁধা!'

'আপনি হাসছেন?'

মৃদু হাসলেন ডঃ কায়সার। হাসির ঠোঁটের কোণেও লাজুক হাসি ঝিলিক দিলো।

'কিছু ভেবো না, হাসি। একটা উপায় বের হবেই।' আশ্বাস দিলেন ডঃ কায়সার।

ষোলো

'বুয়া, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো,' ফরহাদ বললো।

'বলো।'

'এই ব্যাপারে।'

'আমার মনে হয় এটা নিয়ে অনেক বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সমাধান হয়নি। অন্তত আমাদের মধ্যে একটা সুরাহা হওয়া দরকার। তোমার কি মনে হয় চৌধুরী সাহেব ও রেহানা বিয়ে করবে?

'বোধহয়! কেন?' জানতে চাইলো খোদেজা।

তাহলে কে?

কারণ এ বিয়েটা হলেই পুলিশের সন্দেহের অবসান ঘটবে। চৌধুরী সাহেব চালাক লোক। তোমার কি মনে হয় ?'

'আমার আবার কি মনে হবে ?'

'কাকে আড়াল করতে চাইছো, বুয়া।'

'কাউকে না। আমার মতে, কথা কম বলা ভালো। এ বাড়িতে এখন কারো থাকা উচিত না। তুমি বরং বউ নিয়ে তোমার নিজের বাড়িতে চলে যাও।'

'আমি বাড়ি যেতে চাই না,' জেদি ছোট ছেলের মতো বললো ফরহাদ।

'শুধু তোমাদেরই নয়। মাসুদ, টিনারও চলে যাওয়া উচিত। হাসি চলে গিয়ে খুব ভালো করেছে।'

'ঠিকই বলেছো, বুয়া। কিন্তু তুমি যাচ্ছো না কেন ?'

'আমারও যাওয়া উচিত। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

ফরহাদ খোদেজার দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'তুমি জানো কে খুন করেছে। ঠিক কিনা বলো ?'

উঠে দাঁড়ালো খোদেজা। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললো, 'এভাবে বলা ঠিক না। তবু বলছি। তুমি খুব বিপদজনক খেলায় মেতে উঠেছো। আস্ত একটা বোকা তুমি।'

'আসল ঘটনা লুকোতে গিয়ে তোমার বিপদ হতে পারে না ?'

'আমি নিজেকে সামলাতে পারবো। তুমি পারবে না।

তুমি পঙ্গু, অসহায়। তাছাড়া আমি আমার মতামত প্রচার করে বেড়াই না। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি না করাটাই সবদিক থেকে মঙ্গলজনক। আমার মত জানতে চাইলে বলবো, জাফরই খুনী।'

'জাফর ?' স্থির তাকিয়ে জানতে চাইলো ফরহাদ।

'নিশ্চয়ই ? জাফর চালাক ছেলে। সে যে এসব সাফাই তৈরি করেনি তা কে বললো ?'

'কিন্তু ডঃ কায়সার...'

'ডঃ কায়সার, ডঃ কায়সার।' অসহিষ্ণু স্বরে বললো খোদেজা, 'এমনভাবে বলছো যেন তিনি স্বয়ং খোদা। স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবার পরও কি মানুষ আগের সব ঘটনা হুবহু মনে করতে পারে ?'

'তাহলে এটাই তোমার বিবৃতি। তুমি এ থেকে নিশ্চয় একচুলও নড়বে না।'

'ফরহাদ, তোমাকে আবারও সাবধান করে দিচ্ছি। ব্যস, আমার আর কিছু বলার নেই।' খোদেজা বেরিয়ে গেলো।

ফরহাদের ঠোঁটে একটুকরো হাসি ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলিয়ে গেলো। ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত উত্তে-জনা অনুভব করলো সে। সে যেন সত্যের খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেছে। খোদেজার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই বলে আর কোনো কথা তার কাছ থেকে বের করা যাবে বলে মনে হয় না।

ফরহাদ একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করলো,

নাম, ঘটনা, ছোটখাটো তথ্য, প্রশ্নবোধক চিহ্ন···মণি ঘরে এলেও ফরহাদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটলো না।

'কি করছো ?'

'চিঠি লিখছি।'

'হাসিকে ?'

'হাসি ? না, আমি জানি না ও কোথায় আছে। খোদেজা বুয়া যে পোস্টকার্ড পেয়েছে তাতেও কোনো ঠিকানা নেই।'

মণির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো ফরহাদ, 'তোমার হিংসা হচ্ছে, মন !'

মণির সুন্দর চোখ দু'টি বড় শীতল। সে একই রকম শীতল কণ্ঠে বললো, 'হতে পারে।'

অস্বস্তি লাগলো ফরহাদের।

'কাকে চিঠি লিখছো ?'

'সরকারী উকিলকে।' হেসেই বললো ফরহাদ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্রোধের একটা স্রোত বয়ে গেলো তার শিরদাঁড়া বেয়ে। তার কি একটা চিঠি লেখারও অধিকার নেই। মণির মুখের দিকে তাকিয়ে ফরহাদের মন শান্ত হলো। সে বললো, 'ঠাট্টা করছিলাম, মন। আমি টিনাকে লিখছিলাম।'

'টিনাকে ?'

'হ্যাঁ' কারণ এর পরের টার্গেট আমার টিনা।'

মণি কোনো কথা বললো না বা হাসলো না। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলো।

'আপনি সেদিন সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলেন, মিস চৌধুরী,'

টিনাকে প্রশ্ন করলেন পুলিশ কর্মকর্তা হাসান আলী। টিনা হাত দু'টো কোলের ওপর জড়ো করে বসে আছে। তার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি নির্বাক। অকম্পিত মুখের রেখা।

'অনেক আগের কথা। আমার মনে নেই।'

'আপনাকে আসতে দেখেছে একটি ছেলে।'

'তাই নাকি?'

'মিস চৌধুরী, এড়িয়ে যাবেন না। সত্যি কথা বলুন। আপনি বলেছিলেন সে রাতে ঘর থেকে বেরোননি, গান শুনেছিলেন। কিন্তু ঠিক সাতটার আগে আপনাকে এখানে দেখা গেছে। এখানে আপনি কি করছিলেন?'

টিনা কোনো কথা বললো না। হাসান আলী আবার বললেন, 'আপনি কি বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলেন?'

'না।'

'কিন্তু আপনি এসেছিলেন।'

'আপনি বলছেন, আমি এসেছিলাম।'

'আমার বলাবলিতে কিছু আসে যায় না। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।'

এবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে টিনা বললো, 'হ্যাঁ, আমি আমার এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। তবে বাড়ির ভেতরে যাইনি।'

'তারপর?'

'তারপর আমার ঘরে ফিরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে গান শুনি।'

'বাড়ির ভেতরেই যদি না ঢুকবেন তো এলেন কেন ?'

'আসার পরে আমি মত বদলাই।'

'কারণ কি, মিস চৌধুরী ? আপনি কাউকে দেখেছিলেন বা কিছু শুনেছিলেন। সেজন্যেই কি ?'

টিনা নিরুত্তর।

'দেখুন, মিস চৌধুরী। আপনার মা ঐ রাতে খুন হন, সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। ঐ সময়ই আপনাকে এখানে দেখা গেছে। তাছাড়া আপনার কাছে দরজার চাবিও আছে—'

'হ্যাঁ, আমার কাছে চাবি আছে।'

'এমনও হতে পারে, আপনি বাড়ির ভেতরে গিয়ে আপনার মাকে মৃত অবস্থায় দেখেছেন। অথবা…'

'অথবা আমিই খুন করেছি।'

'এটা শুধু সম্ভাবনার কথা। তবে অন্য কেউ করেছে বলেই আমার ধারণা। আমার মনে হয় আপনি জানেন কে খুনী। নয়তো আপনি কাউকে সন্দেহ করেন।'

'আমি বাড়ির ভেতরে যাইনি।'

'তাহলে আপনি কিছু শুনেছেন, বা কাউকে দেখেছেন। সে কি আপনার ভাই মাসুদ ?'

'আমি কাউকে দেখিনি,' শান্তভাবে বললো টিনা।

'তাহলে কিছু শুনেছেন ?'

'না।'

'মিস চৌধুরী, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনার কথা বিশ্বাস

করতে পারলাম না। আপনি এতোটা পথ এসেও বাড়িতে ঢোকেননি, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেননি। মনে হচ্ছে কোনো একটা কিছু আপনাকে মত বদলাতে বাধ্য করেছে। সেটা কি?' ঝুঁকে পড়ে আস্তে করে জানতে চাইলেন তিনি, 'আমার মনে হয় আপনি জানেন কে খুনী।'

টিনা ধীরে মাথা নাড়লো, সে জানে না।

হাসান আলী আবার বললেন, 'আপনি কিছু জানেন। কিন্তু বলছেন না। একবার ভেবে দেখুন এর প্রভাব আপনার পরিবারের উপর কিভাবে পড়ছে। যে ই আপনার মাকে খুন করে থাকুক, তার শাস্তি হওয়া উচিত। আপনি কেন তাকে আড়াল করছেন?'

টিনা আগের মতোই মাথা নাড়লো, 'আমি কিছু জানি না। কিছু দেখিনি বা শুনিনি। এমনিই আমার বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা করেনি বলে ফিরে চলে গিয়েছিলাম।'

সতেরো

ডঃ কায়সার হাসান আলীর নিরাসক্ত ও হতাশ চেহারা দেখে অবাক হলেন। কেননা তিনি শুনেছেন, হাসান আলী তীক্ষ্ণধী একজন সফল পুলিশ অফিসার। হাসান আলীও ডঃ কায়সারকে

ভালো করে দেখলেন। অকালে চুল পেকে গেছে। বুদ্ধিদীপ্ত, শান্ত চেহারা। হাসিটা সুন্দর। হাসান আলী বললেন, 'ন্যায়-বিচারের পক্ষে আমরা সবসময় দাঁড়াই।'

'টু নো ম্যান উইল উই ডিনাই জাস্টিস।' অন্যমনস্কভাবে বললেন ডঃ কায়সার।

'ম্যাগনা কার্টা!' বিস্মিত হাসান আলী বললেন।

'টিনা চৌধুরী আমাকে ম্যাগনা কার্টার কথা বলেছিলেন।'

'অথচ সত্য গোপন করে তিনি ন্যায়বিচারের বিরোধিতা করছেন।'

'তাই নাকি?' সামান্য অবাক হলেন ডঃ কায়সার। তারপর তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানালেন, 'তিনি জানতে চান জাফর কেমন চরিত্রের ছেলে ছিলো।' হাসান আলী জানালেন, 'জাল-জোচ্চুরিতে সিদ্ধহস্ত ছিলো জাফর। বিশেষ করে মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ ছিলো। মেয়েদের সে এমন ধারণা দিতো যেন গভীরভাবে ভালবাসে। অবশ্য তাদের অচিরেই মোহভঙ্গ হতো।'

'কিন্তু জোচ্চোর হলেও জাফরের মধ্যে খুনের ইচ্ছা বা নেশা ছিলো বলে কি আপনাদের মনে হয়েছে?'

'না।'

ডঃ কায়সার পুলিশ সদর দফতর থেকে বেরিয়ে মরিয়মের কাছ থেকে একটি বিশেষ ঠিকানা নিয়ে সেখানে গেলেন।

দরজা খুললেন একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কখনো সুন্দরী ছিলেন বলে মনে হয় না। ডঃ কায়সা-

রকে বসতে দিলেও কথা বলতে প্রথমে রাজি হননি। জাফর, একটি প্যাথোলজিক্যাল কেস এবং তাকে নিয়ে বই লিখতে চান; কিন্তু কারো নাম দেবেন না, ইত্যাদি বলাতে গ্যারেজ মালিকের স্ত্রী মুখ খুললেন।

তিনি জানালেন জাফর যা বলতো, সবই তিনি বিশ্বাস করতেন। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিলো। তিনি জাফরের মায়ের বয়সী একথা অনেকবার বলেছেন। জাফর বলতো, অল্প বয়সী মেয়ে ওর পছন্দ নয়। মনে হতো জাফর তাকে গভীরভাবে ভালবাসে। অথচ আসলে সে ভালবাসতো টাকা!

'হয়তো সে সত্যিই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো!' ডঃ কায়সার সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

মহিলার অসুন্দর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

তিনি বললেন 'জাফর মারা গেছে। কিন্তু আমি তাকে কখনো ভুলবো না। তার জন্যে আমি সব করতে পারতাম। এখনো আমার মনে হয়, জাফর কি সত্যি অতখানি খারাপ ছিলো?'

ডঃ কায়সারের কাছে এর উত্তর জানা নেই।

সূর্যমহলের একটি ঘরে ফরহাদ চিন্তামগ্ন। কিছুটা ক্লান্তও। 'বাড়ি চলো' কথাটা মণির কাছ থেকে এতবার শুনতে হয়েছে, তার উপর সারাদিনে সেবাযত্নের অত্যাচার তো আছেই!

ফরহাদের ধারণা টিনা কিছু জানে। ভাসা ভাসা কানে

এসেছে ছোট ছেলেটির এজাহার। টিনা কাকে আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু যদি সে সত্যিই কাউকে দেখে থাকে তাহলে বলেনি কেন? সে তো জাফরকে পছন্দ করতো না যে তাকে আড়াল করতে চাইবে? অথবা এমনও হতে পারে, টিনা অন্য কাউকে দেখেছিলো। জাফর ধরা পড়ায় সে ভেবেছিলো তার ভুল হয়েছে। কিন্তু সূর্যমহলে সে ছিলো না বা সেদিন আসেনি, একথা একবার বলে ফেলায়, বিবৃতি পরিবর্তন করতে পারেনি।

টিনা আজ বিকালে চা খেতে আসতে রাজি হয়েছে। কিন্তু তার কাছ থেকে কথা বের করা সহজ নয়। যাই হোক। তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সে টিনাকে সরাসরি প্রশ্ন করবে। টিনার জবাব 'হ্যাঁ' অথবা 'না' যে কোনটাই হতে পারে। তবে যদি সে সত্যি কিছু জেনে থাকে, 'না' বলাটা কঠিন হবে। কারণ সে চতুর হলেও মিথ্যাবাদী নয়। আর চুপ করে থাকলে ফরহাদ সেটাকে ইতিবাচক উত্তর বলেই ধরে নেবে।

চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে মণির কথা ভাবলো ফরহাদ। ভাবতে গিয়ে বুকের কোথায় যেন ব্যথা অনুভব করলো সে। যে মেয়েটিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলো, সেই সুন্দরী, সামান্য নির্বোধ মণি আর এখনকার ইস্পাতের মতো কঠিন, আবেগপ্রবণ অথচ স্নেহপ্রবণ নয়, এই মণির পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এই মণি শুধু নিজেকে ভালবাসে, অন্য কারো কথা ভাবে না। ফরহাদকেও সে তার একান্ত নিজের জিনিস মনে করে বলেই ভালবাসে। এই মণিকে ফরহাদ চেনে না!

ফরহাদের মন হতাশার অন্ধকারে ছেয়ে গেলো! আচমকা

দরজায় শব্দ শুনে তার ঘোর কাটলো। রেহানা দাঁড়িয়ে। হাতে একটা সংবাদপত্র।

'উনি বললেন, তুমি আজকের কাগজটা চেয়েছিলে।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলো ফরহাদ, 'ধন্যবাদ। তুমি খুব দক্ষ সেক্রেটারী, রেহানা।'

'না। আজকাল আমারও ভুল হয়।'

'আমাদের সবারই হচ্ছে। তা তোমরা কবে বিয়ে করছো?'

'হয়তো কখনোই না।'

'এটা কিন্তু মস্ত বড় ভুল হবে।'

'ওর ধারণা, এই বিয়ে পুলিশকে অনেক কিছু ভাববার এবং বলবার সুযোগ করে দেবে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রেহানা।

'কিন্তু কখনো না কখনো রিস্ক নিতেই হয়।'

'আমি রিস্ক নিতে রাজি আছি। সুখের জন্যে আমি জুয়ার মতো চোখ বুজে হাত বাড়াতে পারি। কিন্তু উনি…'

'কি?'

'উনি যতদিন বাঁচবেন, রাহেলা চৌধুরীর স্বামী হিসেবেই বেঁচে থাকবেন।' একটু চুপ করে থেকে ক্ষোভ আর তিক্ততা ভরা চোখে ফরহাদের দিকে তাকিয়ে রেহানা আবার বললো, 'এর চেয়ে রাহেলা বেঁচে থাকলেই ভালো হতো। এ বাড়িতে তাঁর অস্তিত্ব রয়ে গেছে চিরকালের জন্যে…'

আঠারো

আগরবাতি জ্বেলে মোনাজাত করলো টিনা। সুন্দর করে বাঁধানো সমাধি-পাথরের ফলকে লেখা :

'রাহেলা চৌধুরীর পুণ্য স্মৃতি
তাঁর সন্তানেরা তাঁকে কোনদিন ভুলবে না'

হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে মাসুদকে দেখে অবাক হলো সে।

'তুমি ?'

'হ্যাঁ, আমি রাহেলা চৌধুরীর কুপুত্র মাসুদ চৌধুরী। আমাকে এখানে দেখে অবাক হচ্ছো ?'

'কিছুটা তো বটেই।'

'আমি কেন এসেছি নিজেই খুব ভালো জানি না। চলে এলাম। হয়তো বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।'

'মাকে ?'

'হ্যাঁ। আমি তেল কোম্পানীর চাকরিটা নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'সে কথা মাকে প্রথম জানাতে এসেছো ?' বিস্ময়ের সঙ্গে

জানতে চাইলো টিনা।

'মনে হলো একটা ধন্যবাদ জানানো দরকার—বা দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।'

'তুমি কিসের জন্যে দুঃখিত, মাসুদ?'

'আমি তাঁকে খুন করেছি বলে দুঃখিত নই। হয়তো এটাই তুমি অবাক হয়ে ভাবছো।'

'আমি ঠিক জানি না।'

'যদি বলি, আমি খুন করিনি। তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে তাঁকে আমি পছন্দ করতাম না। সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধটুকুও আমার ছিলো না। এখন মনে হচ্ছে থাকা উচিত ছিলো।'

'তিনি মারা যাবার পরই কি তোমার ঘৃণা দূর হলো?'

'বোধহয়।'

'আসলে তুমি তাঁকে ঘৃণা করতে না…'

কথা কেড়ে নিয়ে মাসুদ বললো, 'তোমার কথা-ই ঠিক। আমি আমার মাকেই ভালবাসতাম, ঘৃণা করতাম। অথচ মা আমার জন্য এক বিন্দু ভাবেনি। অনায়াসে বিক্রি করে দিয়েছিলো। আর এখন কি মনে হয় জানো?'

'কি?'

'মনে হয়, এটা হয়তো খুব স্বাভাবিক। এখন আর রাগ হয় না।' সমাধির এক পাশে টিনার ব্যাগ ও কিছু ফুল দেখে মাসুদ বললো, 'তুমি কি কবরে ফুল দেবে বলে এনেছো?'

'হ্যাঁ, যাবার সময় সাজিয়ে দিয়ে যাবো।'

'আমি কিছুটা নেবো ?'

'নাও না। সবগুলো নাও।'

মাসুদ ফুলগুলি সযত্নে কবরের উপর বিছিয়ে দিলো। তারপর হাঁটু গেড়ে নত হয়ে বললো, 'মা, আমি তোমার ভালো ছেলে ছিলাম না কখনো। তোমাকে বুঝতেই পারিনি আসলে। অনেক অন্যায় করেছি, অত্যাচার করেছি। তবু তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে। আমি আমার সমস্ত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি।'

উঠে দাঁড়ালো মাসুদ। টিনার দিকে তাকালো, 'চলবে, টিনা ? আমি তো এসব বলার নিয়ম কানুন-কখনো শিখিনি।'

'চলবে।' কোমল দেখালো টিনার দৃষ্টি।

'চলো যাই।' ওরা দু'জন গেটের দিকে এগিয়ে গেলো।

'তুমি কি প্রায়ই আসো এখানে ?' মাসুদ জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ।'

'আমি খুন করিনি, টিনা। কসম খেয়ে বলছি তোমাকে··· আমি না।'

'আমি সে রাতে ওখানে গিয়েছিলাম।'

'সূর্যমহলে ?'

'হ্যাঁ। চাকরি বদলাবার কথা ভাবছিলাম বলে তাঁদের অনুমোদন চাইতে গিয়েছিলাম।'

'তারপর কি হলো খুলে বলো।'

'এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি।'

ওরা দু'জন মাসুদের গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়ালো। টিনা

বললো, 'সন্ধ্যা হবে তখন। সময় দেখিনি। গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। যাবো কি যাবো না, এই দ্বন্দ্ব নিয়ে ধীর পায়ে এগোচ্ছিলাম। এমন সময় কাদের যেন কথাবার্তা শুনতে পেলাম।'

'কাদের?' উত্তেজনায় মাসুদ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

'জানি না। দেখতে পাইনি। ফিসফিস করে বলছিলো। মনে হলো একটি পুরুষ ও একটি মহিলার গলা। একজন বললো, 'সাতটা থেকে সাড়ে সাত। ভুল হয় না যেন।' অন্যজন বললো, 'আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো।' প্রথমজন আবার বললো, 'তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে, লক্ষ্মীসোনা।'

'একথা তুমি পুলিশকে বলোনি কেন?'

'আমি তো ওদেরকে চিনতে পারিনি।'

মাসুদ টিনার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'তুমি কি ভেবেছিলে বাবা ও রেহানা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম বাইরে যাবার জন্য কোনো আলাপ-সালাপ করছেন তাঁরা। অথবা বাবা ও রেহানা না হয়ে হাসি কিংবা অন্য যে কেউ হতে পারে। মণিও হতে পারে, অবশ্যই ফরহাদ না।'

'তুমি কি করলে?'

'আমি গাড়ির কাছে ফিরে গিয়েই আর একজনকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'তুমি ভেবেছিলে সেটা আমি।'

'ঠিক জানি না। তবে তোমার মতোই শরীরের গড়ন। লম্বাও তোমার মতো।'

মাসুদ গাড়ির দরজা খুলে বললো, 'ওঠো।'

'কিন্তু মাসুদ...'

'তোমাকে বলে লাভ নেই যে ওটা আমি ছিলাম না। তার-চেয়ে চলো সূর্যমহলে যাই।'

মাসুদ গাড়ি স্টার্ট দিলো। টিনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'ফরহাদ আমাকে ডেকেছে।'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমাকে নাকি কিছু বলতে হবে না। সে-ই বলবে। আমাকে শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলতে হবে। আমাকে ফরহাদ আরো লিখেছে, আমি যা বলবো, তার গোপনীয়তা সে রক্ষা করবে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করলো মাসুদ। সূর্যমহল খুব কাছেই। গাড়ি পার্ক করে মাসুদ বললো, 'তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু রাস্তায় হাঁটি।'

টিনা বললো, 'তুমি এমন কিছু করে...মানে, আমি বল-ছিলাম...'

হাসলো মাসুদ, 'আত্মহত্যা করবো না। আমাকে তুমি চেনো না?'

অদ্ভুত হাসি দেখা দিলো টিনার মুখে, 'মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা কেউ-ই কাউকে চিনি না।' টিনা সূর্যমহলের দিকে এগিয়ে গেলো। মাসুদ সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাগানে গেলো। শৈশবের স্মৃতি মনে পড়লো। পেয়ারা গাছটা বেয়ে জানালা দিয়ে নামতো সে। বাগানের একটা অংশে তার নিজস্ব

ছোট্ট একটা বাগান ছিলো। তবে এসব তাকে অতোটা টানতো না। যন্ত্রের গাড়ি বা আর সব খেলনাকে খুলে টুকরো টুকরো করতে ভালো লাগতো তার। সে ধ্বংসকামী ছিলো! সামান্য হাসলো মাসুদ, মানুষ বড় হলেও কি খুব একটা বদলায়?

হলঘরে টিনার সঙ্গে মণির দেখা হয়ে গেলো। মণিকে অবাক হতে দেখে টিনা 'থ' বনে গেলো।

'তুমি জানতে না আমি আসবো?'

'ও, হ্যাঁ। ফরহাদ এরকম কি যেন একটা বলছিলো। আমি রান্নাঘরে যাই। বুয়া ফরহাদের জন্যে কফি নিয়ে গেছে। ও চায়ের চেয়ে কফি বেশি পছন্দ করে। ওর স্যুপটা চুলোয় দিয়ে এসেছিলাম। হয়ে গেলো কিনা দেখি।'

'তুমি ফরহাদের সঙ্গে পঙ্গুর মতো ব্যবহার করো কেন? সে তো সত্যিই অতখানি পঙ্গু না?'

শীতল ক্রোধ দেখা দিলো মণির সুন্দর চোখে, 'তোমার স্বামী থাকলে বুঝতে!'

শান্তস্বরে টিনা বললো, 'আমি দুঃখিত।'

'আমি এ বাড়ির বাইরে যেতে চাই ফরহাদকে নিয়ে। আজ আবার হাসিও আসছে।'

'কেন?'

'আমি কি করে জানবো? কাল রাতে ফোন করে জানিয়েছে, সে আসছে।' মণি রান্নাঘরে চলে যেতে টিনা সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে গেলো। সিঁড়ির মুখে দরজাটা খুলে হাসি

বেরিয়ে এলো। টিনাকে দেখে সে চমকে উঠলো।

'হাসি, এইমাত্র মণি বললো তুমি আসবে। এসে গেছো তা তো বলেনি।'

'ডঃ কায়সার আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় না, কেউ জানে যে আমি এসেছি।'

'ডঃ কায়সার কোথায়?'

'চলে গেছেন। বাবা আর রেহানা মনে হয় লাইব্রেরিতে। তুমি দেখা করতে যাচ্ছো?'

'পরে যাবো। আমাকে ফরহাদ কেন ডেকেছে দেখি।' লাইব্রেরির দরজা পার হয়ে মণি-ফরহাদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো টিনা। খোদেজা ট্রে হাতে ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। পায়ের শব্দে দ্রুত ঘাড় ফেরালো, 'টিনা। একেবারে চমকে দিয়েছো। আমি ফরহাদের কফি দিতে এসেছি।' দরজায় টোকা দিলো সে।

একমুহূর্ত থেমে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো খোদেজা। তার দীর্ঘ দেহের পেছনে ছোটখাটো টিনা ঢুকলো। কিছু দেখার আগেই খোদেজার আর্তস্বর শুনতে পেলো। খোদেজার হাত থেকে ট্রে-টা পড়ে গিয়ে কাপ -পিরিচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

'না, না।' কেঁদে উঠলো খোদেজা। টিনা খোদেজাকে সরিয়ে এগিয়ে গেলো। ফরহাদ বোধহয় লিখছিলো। হাতের কাছেই কলমটা। মাথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। মাথার চাঁদিতে উজ্জ্বল লাল রক্ত জমে গেছে।

'মরে গেছে। কেউ ছুরি মেরেছে। ঠিক চাঁদি বরাবর।' অসংলগ্নভাবে বললো খোদেজা। তারপর কণ্ঠ চড়িয়ে বলতে লাগলো, 'আমি সাবধান করেছিলাম। আমার যতদূর সাধ্য আমি করেছিলাম। সে শোনেনি। বাচ্চা ছেলের মতো বিপদ-জনক খেলায় মেতে উঠেছিলো।'

টিনার মাথাটা চক্কোর দিলো। সমস্ত ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো। ফরহাদ তার কাছে কি জানতে চেয়েছিলো? আর কখনো তার জানা হবে না কি ছিলো ফরহাদের মনে। সে কিছু লিখছিলো। কিন্তু খুনী কাগজটা সরিয়ে ফেলেছে।

'সবাইকে জানানো দরকার।' যান্ত্রিকভাবে বললো টিনা।

পাশাপাশি ওরা দু'জন দরজার দিকে পা বাড়ালো। টিনা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া কাঁচের টুকরোর দিকে তাকালো। খোদেজা বললো, 'ওগুলো পরে পরিষ্কার করা যাবে।' টিনার বাহু জড়িয়ে ধরলো খোদেজা। টিনা তার শরীরের উপর সমস্ত ভর ছেড়ে দিলো।

ওরা বাইরে আসতেই লাইব্রেরির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন আনিস চৌধুরী ও রেহানা। টিনা পরিষ্কার শান্তস্বরে বললো, 'ফরহাদকে কেউ ছোরা দিয়ে খুন করেছে।'

টিনা স্বপ্নের ঘোরেই যেন শুনলো বাবার আর্তচিৎকার। রেহানাকে ছুটে যেতে দেখলো ফরহাদের ঘরে। ফরহাদ! ফর-হাদ মরে গেছে!

'মণিকে খবরটা দেয়া দরকার।' খোদেজা টিনাকে ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। টিনাও নেমে সামনের খোলা

দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। মাসুদ সামনে দাঁড়িয়ে। সোজা ছুটে গিয়ে তার বুকে লুটিয়ে পড়লো টিনা, 'ওহ্ মাসুদ!'

মাসুদ ওকে আঁকড়ে ধরে বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে টিনা।'

হাসি ভেতর থেকে ছুটে বাইরে আসতেই মাসুদ অসহায়ের মতো বললো, 'টিনা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি এই প্রথম টিনাকে জ্ঞান হারাতে দেখলাম।'

'শক্ পেয়ে টিনার এমন হয়েছে,' হাসি বললো।

'কিসের শক্?'

'তুমি জানো না ফরহাদ খুন হয়েছে?'

'কখন? কেমন করে?'

'এখনই।'

মাসুদ টিনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে রাহেলা চৌধুরীর পড়ার ঘরের সোফায় শোয়ালো। তারপর হাসিকে বললো, 'মামুনকে ফোন করো।'

'বাবা করেছেন। এসে যাবে এখুনি। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো হাসি। ডাঃ মামুন হায়দার হলঘরে ঢুকে খোদেজার দেখা পেলো, 'যা শুনলাম, তা কি সত্যি? ফরহাদ খান খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আহত নয় তো?'

'না।' ক্লান্ত আবেগহীন স্বরে খোদেজা বললো, 'কোনো সন্দেহ নেই। একেবারে মরে গেছে। মাথার চাঁদিতে ছোরা মেরেছে।' নিজের মাথার চাঁদিটা দেখালো খোদেজা।

'পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে ?'

'জানি না।'

মাসুদ বেরিয়ে এলো হলঘরে, 'মামুন, টিনাকে একবার দেখবেন ?'

'আসছি।' মামুন ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো। ঠিক এই সময় রান্নাঘর থেকে ধীর পায়ে মণি বেরিয়ে এলো, 'বুয়া।'

খোদেজা তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গেলো। মাসুদ অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকলো।

'এ সত্যি নয়।' মণি কর্কশ উচ্চকণ্ঠে বললো, 'এ হতে পারে না। তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। আমি ওকে ভালো দেখে এসেছি। ও লিখছিলো। আমি মানা করলাম। কেন সে এমন করলো ? কেন আমার কথা শুনে চলে গেলো না ?'

খোদেজা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। মামুন হায়-দার বেরিয়ে এসে বললো, 'কে বলেছে টিনা অজ্ঞান হয়ে গেছে ?'

'কেন ? বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো।'

'লুটিয়ে পড়েছিলো ঠিকই', কঠিন স্বরে বললো মামুন। 'ফোন করতে হবে অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে। এক্ষুণি।'

'অ্যাম্বুলেন্স !'

'হ্যাঁ !' ক্রুদ্ধভাবে বললো মামুন, 'টিনা অজ্ঞান হয়নি। শুনছেন আপনারা ? তাকে ছোরা মারা হয়েছে। এখুনি হাস-পাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

উনিশ

ডঃ কায়সার যখন সূর্যমহলে পৌঁছলেন, তখন প্রথম দিনের মতোই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কলিং বেলে আঙুল রাখতে গিয়ে তাঁর মনে হলো, এই বাড়ির নাম আগে ছিলো নাগমহল।

আগের মতোই যেন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো। দরজা খুলে দিলো হাসি। তার চোখে মুখে বিষণ্ণতা। পিছনে খোদেজাকে দেখা গেলো। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু মুহূর্তে ছবিটি বদলে গেলো। হাসির মুখ থেকে বিষণ্ণতা মুছে গিয়ে সেখানে সুন্দর নির্মল হাসি ফুটে উঠলো।

'আপনি! কি যে ভালো লাগছে এসেছেন বলে।'

ডঃ কায়সার হাসির কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, হাসি।'

'বাবা লাইব্রেরিতে। রেহানাও আছে।'

খোদেজা এগিয়ে এলো। 'আপনি আবার কেন এসেছেন?' অভিযোগের সুরে সে বললো, 'আপনার জন্যেই আজ আমাদের এই বিপদ। হাসি আর চৌধুরী সাহেবের জীবনটা নষ্ট হয়ে

গেলো। ফরহাদ আর টিনা মারা গেলো। এ সমস্তই আপনার জন্যে।'

'টিনা এখনো বেঁচে আছে। আমি যে জন্যে এসেছি, তা শেষ না করে ফিরে যেতে পারি না।'

'আপনি কি করতে এসেছেন?' খোদেজা সিঁড়ির মুখে তাঁর পথ আগলে জানতে চাইলো।

'আমি যা শুরু করেছিলাম, তা শেষ করতে এসেছি—আর কিছু নয়।'

ডঃ কায়সার পা বাড়ালেন। হাসি তাঁকে অনুসরণ করলো। বাধ্য হয়ে খোদেজাকে সরে দাঁড়াতে হলো। ডঃ কায়সার পেছন ফিরে বললেন, 'আপনিও আসুন। আমি আপনাদের সবাইকে একসঙ্গে চাই।'

লাইব্রেরিতে আনিস চৌধুরী চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে। রেহানা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। দু'জনেই অবাক হলো।

'দুঃখিত এভাবে অনধিকার প্রবেশের জন্যে। কিন্তু আমি যা শুরু করেছি, তা শেষ করার দায়িত্বও আমার। সেই জন্যেই এসেছি আমি। মিসেস ফরহাদ খান আছেন? দয়া করে তাঁকেও ডাকুন।'

'শুয়ে আছে বোধহয়। মণির পক্ষে এ প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে।' সখেদে মাথা নাড়লেন আনিস চৌধুরী।

'আমার মনে হয় তাঁকেও ডাকা দরকার।' জোর দিয়ে

বললেন ডঃ কায়সার। তারপর খোদেজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তাকে ডেকে আনুন।'

'সে হয়তো আসতে চাইবে না।' গোমড়া মুখে বললো খোদেজা।

'তাকে বলবেন, তার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু কথা যদি জানতে চান তাহলে যেন আসেন।' বললেন ডঃ কায়সার।

'ওহ্ বুয়া, যাও না, ডেকে আনো। জানি না উনি কি বলবেন। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের সবার সেটা শোনা উচিত।' অধৈর্যভাবে বললো হাসি।

'ঠিক আছে।' খোদেজা বেরিয়ে গেলো।

'বসুন।' আনিস চৌধুরী ডঃ কায়সারকে বললেন। ডঃ কায়সার বসলেন।

'আপনি কিছু মনে করবেন না, ডঃ কায়সার। আমার মনে হয় আপনার প্রমথবার আসাটাই ভুল হয়েছিলো।'

'বাবা, এটা তোমার ভয়ানক অন্যায়,' প্রতিবাদ করলো হাসি।

'আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। আপনার জায়গায় হলে আমিও হয়তো তাই ভাবতাম। কিন্তু কিছু করার ছিলো না আমার।'

একটু পর খোদেজা ঢুকলো। পেছনে মণি। ডঃ কায়সার তাকে এই প্রথম দেখলেন। পোশাকে ও প্রসাধনে মণিকে পরিপাটি দেখাচ্ছে। ভীষণ শান্ত, স্থির মনে হলো। কিন্তু তার মুখে যেন অভিব্যক্তিহীন একটা মুখোশ আঁটা। তাকে দেখে

মনে হলো ঘুমের মধ্যে চলাফেরা করছে যেন।

আনিস চৌধুরী আলাপ করিয়ে দিলেন। ডঃ কায়সার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিসেস খান, আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু আমি মনে করি, আমার কথাগুলো আপনার শোনা দরকার।'

'কিন্তু কোনো কথা বা কোনো ঘটনাই ফরহাদকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মণি।

ডঃ কায়সার সবার দিকে তাকালেন। তারপর শুরু করলেন, 'আমি জাফরের নির্দোষিতার কথা বলতে যেদিন প্রথম এলাম সেদিন আপনাদের প্রতিক্রিয়া আমাকে বিস্মিত করেছিলো। কিন্তু হাসির কথা আমার মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। সে বলেছিলো, ন্যায়বিচারে কিছু আসে যায় না। যারা নির্দোষ, তাদের ক্ষতি করে গেলাম আমি। কথাটা ঠিক, যারা নির্দোষ, তাদের যন্ত্রণার কোনো অর্থ নেই। তাদের কষ্ট দেয়াটা অন্যায়। তাদের সেই কষ্ট আর যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে আমি এখানে এসেছি।' কেউ কোনো কথা বললো না। পিনপতন নীরবতার মধ্যে ডঃ কায়সারের শান্ত, ধীর কণ্ঠ শোনা গেলো, 'জাফরের নির্দোষিতা আপনাদের জন্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে আনেনি। আমি বলবো, জাফরের দণ্ড হওয়াতে আপনারা সবাই সন্তুষ্ট ছিলেন। রাহেলা চৌধুরী হত্যা মামলার এর চেয়ে ভালো কোনো সমাধান ছিলো না।'

'কথাটা কি একটু কঠোর হয়ে গেলো না?' আনিস চৌধুরী বললেন।

'না, কারণ এটাই নির্মম সত্য। আপনারা মেনে নিয়েছিলেন। যেহেতু বাইরের কেউ খুনটা করেনি, এবং যেহেতু আপনাদের মধ্যে জাফরই একাজের জন্যে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যক্তি। জাফর ছিলো ভাগ্যহত, মানসিকভাবে পঙ্গু সমস্যা সৃষ্টিকারী। কিন্তু মিঃ চৌধুরী, আপনি তাকে দোষী মনে করেননি। আপনার ভাষ্য অনুযায়ী তার মা বেঁচে থাকলে তিনিও করতেন না। একমাত্র লোক যে তাকে দোষী মনে করেছে, সে আপনি।' খোদেজার দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন ডঃ কায়সার, 'আপনি বলেছিলেন, জাফর ধূর্ত।'

'হয়তো সত্যি কথাটাই বলেছিলাম!'

'হ্যাঁ, সত্যই ধূর্ত ছিলো। সে ধূর্ত না হলে এতো কিছু ঘটতো না। কিন্তু আমি তাকে দোষমুক্ত করেছিলাম। প্রমাণ করেছিলাম যে…'

'ওসব সাক্ষ্য-প্রমাণে কিছু আসে-যায় না,' বললো খোদেজা। 'আপনি তো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভালো হবার পরও কি আগের সব কথা হুবহু মনে থাকে?'

'তাহলে এটাই আপনার ধারণা? আপনি এখনো মনে করেন এ কাজ জাফরই করেছে এবং কৌশলে সাক্ষ্য-প্রমাণ বানিয়েছে।'

'আমি এখনো বলবো জাফরই এ কাজ করেছিলো। এবং এখানকার সবার সমস্ত যন্ত্রণা আর ওই বীভৎস মৃত্যুর জন্যেও সে-ই দায়ী।'

'কিন্তু বুয়া, তুমি তো তাকে খুব ভালবাসতে,' হাসি বললো।

'হয়তো। তবু আমি বলবো, সে ছিলো ধুরন্ধর।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা ঠিক নয়। আমার প্রতিটি খুঁটিনাটি মনে আছে। সে রাতে আমি জাফরকে লিফ্‌ট দিয়েছিলাম। আমি স্পষ্ট করে আবার বলছি, জাফর চৌধুরী তার মা রাহেলা চৌধুরীর হত্যাকারী নয়।'

'আনিস চৌধুরীকে অস্থির দেখালো। ডঃ কায়সার বলে চললেন, আমার পুনরাবৃত্তিতে আপনারা হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আরো কিছু ব্যাপার আছে, যা বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। হাসান আলী আমাকে বলেছেন, জাফর তার জবানবন্দী দিতে গিয়ে সময়, স্থান ইত্যাদির ব্যাপারে একটুও নড়চড় করেনি। অর্থাৎ সে মিনিট সেকেণ্ড ধরে সময় বলেছে। যেন এই জবানবন্দী তার আগে থেকেই তৈরি ছিলো। ডাঃ মাহবুবের কথা এ প্রসঙ্গে মনে করা যায়। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, জাফরের মতো চরিত্রের ছেলেরা হত্যার বীজ মনে মনে পুষে রাখে, পরিকল্পনা করে, কিন্তু নিজে খুন করে না। তাই জাফর খুনী হিসেবে ধরা পড়ায় তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, জাফর বড় জোর অন্য কাউকে দিয়ে এ কাজ করাতে পারে। তখন আমার মনে হয়েছিলো, তাহলে কি জাফর জানতো সে রাতে এই ঘটনা ঘটবে? সে কি জানতো যে তার সঠিক স্থান-কাল দরকার হবে নিজেকে নিরপরাধী প্রমাণ করার জন্যে? তাই কি ধরা দিতে সে অতোটা আপত্তি করেনি, কারণ সে জানতো সে খুন করেনি এবং সেটা প্রমাণিতও

হবে ? তার অর্থ এই দাঁড়ায়, অন্য কেউ রাহেলা চৌধুরীকে খুন করেছে এবং জাফর সেটা জানতো। জাফরই এই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা।'

ডঃ কায়সার একটু থেমে খোদেজা খাতুনের দিকে তাকালেন, 'আপনিও তাই মনে করেন, ঠিক কিনা ? আপনি মনে করতে চান খুনটা জাফর করেছে, আপনি নন ! এও মনে করেন : জাফরের আদেশ ও প্রভাবে আপনি এটা করেছেন, ফলে সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার। তাই না ?'

'আমি ? আপনি কি বলছেন ?'

'আমি বলছি, এ বাড়িতে একমাত্র ব্যক্তি আপনি, যাকে জাফরের সহযোগী হিসেবে ধরা যায়। জাফরের যা রেকর্ড তাতে দেখা গেছে, সে মধ্যবয়সী রমণীদের মনোরঞ্জনে সক্ষম। এ ধরনের মানুষেরা তাকে সহজেই বিশ্বাস করেছে।' ডঃ কায়সার একটু ঝুঁকে নিচু গলায় বললেন, 'সে আপনাকে ভালবাসার কথা বলতো, তাই না ?' কোমল শোনালো তাঁর কণ্ঠ, 'সে বিশ্বাস করিয়েছিলো যে সে আপনার কথা ভাবে, আপনাকে বিয়ে করতে চায়। সব চুকে-বুকে গেলে, মায়ের টাকা হাতাতে পারলে সে আপনাকে বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যাবে।'

খোদেজা একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোনো কথা বললো না। যেন সে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

'অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনের মতো ইচ্ছাকৃতভাবে জাফর এটা করেছিলো।' বললেন ডঃ কায়সার, 'জাফর সে রাতে টাকার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটে এসেছিলো। ঐ সময় টাকা না পেলে

তার জেল-জরিমানা হবে এই বলে রাহেলা চৌধুরীর কাছে টাকা চায়। তিনি সোজাসুজি টাকা দিতে অস্বীকার করলে জাফর আপনার কাছে যায়।'

'আপনি কি মনে করেন, আমি আমার নিজের টাকা না দিয়ে রাহেলা চৌধুরীর টাকা তাকে দেবো?'

'না, তা মনে করি না। আপনার থাকলে আপনি দিতেন। কিন্তু আমার ধারণা আপনার জমানো টাকা ওকে দিয়ে দিয়ে আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সে রাতে জাফরের সঙ্গে আপনার বাগানে দেখা হলো। তখন মিসেস চৌধুরী লাইব্রেরিতে গেছেন স্বামীকে সব বলতে। জাফর আপনাকে বললো, ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি করে পরে মিসেস চৌধুরীকে খুন করতে। কারণ এ চুরি ঢাকা কঠিন হবে। তবে সহজ উপায় অবশ্য সে একটা বলেছিলো। যেমন আপনাকে ড্রয়ারটা খোলা রাখতে হবে যাতে মনে হয় কোনো চোর এসেছিলো। এবং খুব সাবধানে মিসেস চৌধুরীর মাথার পেছন দিকে আঘাত করতে হবে। সে বলেছিলো এতে কোনো ব্যথা বা কোনো কিছু টের পাবার আগেই তিনি অক্কা পাবেন। এবং সে তার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ তৈরি করে রাখবে। অতএব আপনাকে সময় সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। খুনটা যেন সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে হয়।'

'মিথ্যা কথা!' কাঁপতে লাগলো খোদেজা, 'আপনি উন্মাদের মতো প্রলাপ বকছেন।' কিন্তু তার কণ্ঠ জোরালো শোনা গেলো না, অনেকটা যান্ত্রিকভাবে বললো, 'আর যদি সত্যিও

হয়, আপনি কি মনে করেন তাকে অপরাধ কাঁধে নিতে দিতাম ?'

'দিয়েছিলেন, কারণ আপনি জানতেন সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে।'

'কিন্তু যখন পারলো না, তখনো কি আমি তাকে বাঁচাতাম না ?'

'হয়তো চেষ্টা করতেন। কিন্তু শুধু একটি কারণে আপনি তা করেননি। জাফরের স্ত্রী এসে হাজির হয়। আপনি জানতেন না, সে বিবাহিত। আপনাকে একথা বিশ্বাস করাতে মেয়েটিকে বেগ পেতে হয়। আপনার মাথায় তখন সমস্ত পৃথিবী ভেঙে পড়লো। আপনি জাফরের আসল চেহারা দেখতে পেলেন। হৃদয়হীন, ধূর্ত, ফন্দিবাজ···, বুঝলেন আপনার প্রতি তার বিন্দু-মাত্র ভালবাসা নেই। আপনি জানলেন, সে আপনাকে নিয়ে খেলেছে, নিষ্ঠুরভাবে খেলিয়েছে।'

হঠাৎ করেই যেন খোদেজার মুখ খুলে গেলো। অসংলগ্ন-ভাবে কথাগুলো বেরিয়ে আসতে লাগলো, 'আমি তাকে ভাল-বাসতাম। আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম। আমি একটা আহাম্মক ছিলাম। গর্দভ ছিলাম। সে বিশ্বাস করিয়ে-ছিলো, অল্পবয়সী মেয়ে তার ভালো লাগে না। তারপর ঐ মেয়েটি এলো—মরিয়ম। আমি জাফরের নীচ অভিনয় আর হারামীপনা বুঝতে পারলাম।'

'আমাকে এখানে দেখে আপনি ভয় পেয়েছিলেন। হাসিকে স্নেহ করেন, আনিস চৌধুরীকে আপনি শ্রদ্ধা করেন। তাদের জন্যে ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলেন

নিজের জন্যে। আপনার ভয় আপনাকে চালিত করেছে আরো গভীর খাদে। এখন আপনার হাতে আরো দু'টি খুন…'

'আপনি বলতে চান, আমি ফরহাদ আর টিনাকে খুন করেছি?'

'নিশ্চয়। মারা যায়নি, হাসপাতালে টিনার জ্ঞান ফিরেছে।'

'সে বলেছে আমি তাকে ছোরা মেরেছি? সব ফাঁস হয়ে গেছে?' হতাশ হয়ে বললো খোদেজা, 'এখন আর লুকিয়ে লাভ নেই—আমি ভেবেছিলাম সে বুঝতে পারেনি। আমি ভয়ে আধ-মরা হয়ে গিয়েছিলাম।'

'টিনা কি বলেছে, জানেন?' ডঃ কায়সার বললেন, 'সে বলেছে, কাপটা খালি ছিলো!' আপনি ভান করেছিলেন যে, আপনি ফরহাদের জন্যে কফি নিয়ে যাচ্ছেন। তখন আপনি আসলে ফরহাদকে খুন করে মাত্র বেরিয়েছেন। টিনাকে দেখে আপনি কফি দেবার নাম করে আবার ঢুকলেন। টিনা যদিও শক্ পেয়ে অর্ধচেতন ছিলো, তবু তার দৃষ্টি এড়ায়নি যে, কফির কাপ খালি ছিলো। এক ফোঁটা কফিও ভাঙা টুকরোর মধ্যে দেখা যায়নি।'

'কিন্তু বুয়া কি করে টিনাকে ছোরা মারবে? টিনা সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাসুদের কাছে গেলো, তখনো তো সে ভালোই ছিলো,' চেঁচিয়ে বললো হাসি।

'হয়, এরকম হয়। ছোরা খাবার পরও কিছু টের না পেয়ে মানুষ সুস্থভাবে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে পারে। টিনা যেরকম আঘাত পেয়েছিলো, তাতে তার টের না পাবারই কথা।'

ডঃ কায়সার আবার খোদেজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পরে আপনি মাসুদের পকেটে ছোরাটা ফেলে দিয়েছিলেন। এটি সবচেয়ে খারাপ কাজ করেন আপনি।'

খোদেজা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দু'টো সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'আমি পারিনি। সবকিছু ঘনিয়ে আসছিলো। চারিদিকে অন্ধকার দেখছিলাম। আমার ভয় ধরে যায়। ফরহাদ সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছিলো। টিনা নিশ্চয় আমাদের বাগানে কথা বলতে শুনেছিলো। আমি টিনাকে খুন করতে চাইনি। ফরহাদের ব্যাপারে···'

মণি উঠে দাঁড়ালো। ধীর অথচ দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেলো, 'তুমি ফরহাদকে খুন করেছো? তুমি··· ?'

অকস্মাৎ বাঘিনীর মতো খোদেজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মণি। কিন্তু চকিতে রেহানা ছুটে দুজনার মাঝে দাঁড়িয়ে মণিকে ধরে ফেললো। ডঃ কায়সার উঠে গিয়ে তাকে সাহায্য করলেন। মণি কেঁদে উঠলো, 'তুমি···তুমি··· !'

খোদেজা তার দিকে তাকিয়ে তিক্তস্বরে বললো, 'ফরহাদ, কেন নাক গলাতে গেলো? তার জন্যে তো এটা জীবন মরণ সমস্যা ছিলো না। তাহলে কেন ?'

খোদেজা ঘুরে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। কারো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থকে।

'ওকে থামাও !' চেঁচিয়ে উঠলো হাসি।

'না যেতে দাও,' বললেন আনিস চৌধুরী।

'ও যদি আত্মহত্যা করে ?' হাসি বললো।

'আমার সন্দেহ আছে,' বললেন ডঃ কায়সার। 'সে সুযোগ ও পাবে না। পাশের ঘরে লুকিয়ে বসে সমস্ত কথা রেকর্ড করেছেন পুলিশের কর্মকর্তা হাসান আলী। আমরা সবাই তো সাক্ষী রইলামই। এখুনি হাতকড়া পড়বে ওর হাতে।' মৃদু হাসলেন তিনি, 'অপরাধ একদিন ধরা পড়েই।'

'খোদেজার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। ও এতো ভালো ছিলো।' আনিস চৌধুরী বললেন।

রেহানা তাঁর কাছে গিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললো, 'কেমন করে তোমার মায়া হয় ? ওর জন্যে আমরা সবাই কতো কষ্ট পেয়েছি।'

'জানি। কিন্তু কষ্ট কি সে-ও কম পেয়েছে ?'

'ওর জন্যে আমাদের বাকি জীবনটা হয়তো আরো অসহ্য হয়ে উঠতো।' রেহানা কৃতজ্ঞ চোখে ডঃ কায়সারের দিকে তাকালো, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ডঃ কায়সার।'

'যা হোক, দেরিতে হলেও আমি শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারলাম। সেজন্যে আমি খুশি।' মৃদু কণ্ঠে বললেন ডঃ কায়সার।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে!' তিক্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো মণি, 'কেন আমরা বুঝতে পারিনি ? আমি এতদিন হাসিকেই খুনী ভেবে এসেছি।'

হাসি বিজয় গর্বে ডঃ কায়সারকে দেখিয়ে বললো, 'উনি কক্ষণো ভাবেননি।'

মণি শান্ত ভাবে বললো, 'আমি মরে গেলে শান্তি পেতাম।'

'মা গো, তোকে যদি সাহায্য করতে পারতাম!' স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন আনিস চৌধুরী।

'আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। ফরহাদ এটাই চেয়েছিলো। সে নিজেই নিজের মরণ ডেকে এনেছিলো। তোমরা কেউ আমার অবস্থা বুঝবে না।' মণি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। হাসি এবং ডঃ কায়সার তাকে অনুসরণ করলেন। বেরিয়ে গিয়ে ডঃ কায়সার পেছন ফিরে তাকালেন। রেহানা আনিস চৌধুরীর কোলে মুখ গুঁজে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তিনি রেহানার মাথায় হাত রাখলেন।

বিশ

মাথা নাড়লেন ডঃ কায়সার।

না এভাবে নয়। ভুল পথে এগোচ্ছিলেন তিনি। রাহেলা চৌধুরীকে নিয়ে পড়ে না থেকে তাঁর উচিত ছিলো জাফরকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা।

মানুষ জাফর। জন্মসূত্রে যে পথভ্রষ্ট। কোনো ভালো পরিবেশই তাকে পথে আনতে পারতো না। ডাঃ মাহবুব বলেছি-

.লেন একথা।

আনিস চৌধুরী মমতার সঙ্গে বলেছিলেন, অসংযমী। প্রকৃতির সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। আধুনিক মনস্তত্ত্ব যাকে বলবে মানসিক ভাবে পঙ্গু, তবে অপরাধী নয়।

হাসি বলেছিলো, ছেলেমানুষের মতোই জানিয়েছিলো, জাফরকে সে দেখতে পারতো না। টিনা বলেছিলো, সে জাফরকে অপছন্দ আর অবিশ্বাস করতো। খোদেজার ভাষায় জাফর ছিলো ধূর্ত। মরিয়ম জাফরের যে ছবি তুলে ধরেছে তাতে বোঝা যায় জাফরের একটিই লক্ষ্য ছিলো—টাকা।

টাকা! টাকা!! টাকা!!!

রাহেলা চৌধুরীর টাকা। ট্রাস্টে রাখা টাকা। ব্যাঙ্ক থেকে আনা টাকা। টাকা ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না। ওর পকেটে পাওয়া গিয়েছিলো ব্যাঙ্ক থেকে তোলা টাকা। ও অবশ্য শপথ করে বলেছিলো ওই টাকা তার মা তাকে দিয়েছে। উঁহুঁ! সমস্ত ব্যাপারটা একটা আকার নিতে গিয়েও নিতে পারছে না শুধু কয়েকটি হারানো সূত্রের জন্যে! ঘড়ির দিকে তাকালেন ডঃ কায়সার। হাসিকে কথা দিয়েছেন ঠিক এই সময় ফোন করবেন।

ফোন হাসিই ধরলো, 'হাসি, ভালো আছো তো?'

'আমি ভালো আছি,' হাসি তার ছেলেমানুষী ভরা হালকা কণ্ঠে বললো। 'আমি' শব্দটার উপর যেন সে বিশেষ জোর দিলো।

'কি হয়েছে, হাসি!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন ডঃ কায়সার।

'ফরহাদ খুন হয়েছে।'

'ফরহাদ! মণির স্বামী?'

'হ্যাঁ। আর টিনাও। মানে, টিনা মরেনি। হাসপাতালে আছে।'

'খুলে বলো,' আদেশের সুরে বললেন ডঃ কায়সার। হাসি সব খুলে বললো। আরো যা যা জানবার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিলেন তিনি।

তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'হাসি, আমি আসছি। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবো। তার আগে আমাকে একবার হাসান আলীর কাছে যেতে হবে।

ডঃ কায়সার ও হাসান আলী যখন কথা বলেছেন, তখনি ফোনটা বাজলো।

'হ্যালো? হ্যাঁ, বলছি ··বলো, শুনতে পাচ্ছি। কি বললে? জ্ঞান ফিরেছে?··· কি বলেছে?·· তার অর্থ কি? আর কিছু বলেনি?···ঠিক আছে। ছাড়ি।'

'হাসপাতাল থেকে?' জানতে চাইলেন ডঃ কায়সার।

'হ্যাঁ। অল্পক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরেছিলো।'

'কি বলেছে?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন ডঃ কায়সার।

'আপনাকে আমি কেন এসব বলবো বুঝতে পারছি না।'

'জানতে চাইছি বলে বলবেন। আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।'

'আপনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটির জন্যে নিজেকে দায়ী করছেন!'

'হ্যাঁ। এমনকি এই দু'টি দুঃখজনক ঘটনার জন্যেও আমি নিজেকে দায়ী মনে করি। মেয়েটি বাঁচবে তো?'

'সম্ভবত। একটুর জন্যে হৃৎপিণ্ডে বেঁধেনি। তবে-কিছুই বলা যায় না এখনো। যখন ওরা জানলো খুনী ওদের মধ্যেই আছে, তখন নিজেদের নিরাপত্তার কারণেই সব কথা খুলে বলা উচিত ছিলো। ফরহাদ খান বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সে এটাকে খেলা হিসেবে নিয়েছিলো। ফাঁদ পেতেছিলো। তার ফল যা হলো তা তো দেখলেনই।'

'আর মেয়েটি?'

'সে ও কিছু জানতো। কিন্তু বলতে চায়নি। মেয়েটি মাসুদকে ভালবাসতো বলেই আমার ধারণা।'

'মাসুদকে?'

'হ্যাঁ। মাসুদও তাকে পছন্দ করতো। তবে মানুষ যখন ভয়ে দিশাহারা হয়ে যায় তখন পছন্দ-অপছন্দ মনে থাকে না। ফরহাদের লাশ আবিষ্কার করার পর সে যখন মাসুদের বুকে লুটিয়ে পড়েছিলো, তখনই সে সুযোগটা নেয়।'

'এটা আপনার অনুমান মাত্র।'

'শুধু অনুমান নয়। ছোরাটা মাসুদের পকেটে পাওয়া গেছে।'

'আসল ছোরা?'

'হ্যাঁ, রক্তমাখা। যদিও আমরা পরীক্ষা করতে দিয়েছি। তবে তাতে ফরহাদ ও টিনার রক্ত পাওয়া যাবে।'

'এটা হতে পারে না।'

'কে বলেছে হতে পারে না ?'

'হাসি। আমি ফোন করেছিলাম।'

'তাই নাকি ? কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে কোনো প্যাঁচ নেই। মণি ফরহাদকে জীবিত দেখেই রান্নাঘরে গিয়েছিলো। তখন চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। রেহানা ও আনিস চৌধুরীও ছিলেন লাইব্রেরিতে। হাসি তার ঘরে। খোদেজা রান্নাঘরে। চারটে বাজার পর পরই মাসুদ ও টিনা এলো। মাসুদ বাগানে আর টিনা খোদেজার পিছনে পিছনে ওপরে গেলো। খোদেজা ফরহাদের জন্যে কফি নিয়ে গিয়েছিলো। টিনা মাঝে হাসির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খোদেজার সঙ্গেই ঘরে গেলো এবং ফরহাদের লাশ দেখতে পেলো।'

'এই সারাটা সময় মাসুদ বাগানে ছিলো।'

'ডঃ কায়সার, আপনি হয়তো জানেন না যে, একটা পেয়ারা গাছ আছে বাড়ির পিছন দিকে। সেই গাছ বেয়ে ছোটবেলায় মাসুদ অনেক ওঠা-নামা করেছে। তার পক্ষে ঐ গাছ বেয়ে উঠে খুন করে আসা মোটেই অসম্ভব নয়। সে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। ফরহাদের সঙ্গে টিনার সাক্ষাৎ বন্ধ করতে যে বদ্ধপরিকর, তার পক্ষে দু'জনকেই খুন করা সম্ভব। সুযোগও পেয়েছিলো।'

'টিনার জ্ঞান ফিরেছিলো বললেন না ? কি বলেছে সে ?'

'সে কি বলেছে হুবহু শুনতে চান ? সে প্রথম বলেছে 'মাসুদ'...'

'তাহলে সে মাসুদকেই দায়ী করেছে !'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। এছাড়া বাকি যা বলেছে, তার অর্থোদ্ধার আমরা করতে পারছি না।'

'যেমন?'

'মাসুদের নাম উচ্চারণ করার পর সে বলেছে 'কাপটা খালি ছিলো।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে ...'এর কি অর্থ আপনি করবেন?'

সায় দিলেন ডঃ কায়সার, 'বলা কঠিন। আপনারা কি মাসুদকে গ্রেফতার করেছেন?'

'আটক করেছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার্জশীট দেয়া হবে। আপনার সন্দেহের তালিকায় বোধহয় মাসুদ চৌধুরী নেই?'

'না। এমনকি আপনার সব কথা শোনার পরও নয়। আমার মনে হয়, আমার ধারণাই ঠিক। তবে এখনো কিছু বলতে পারছি না। আমার একবার ওদের সবার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার!' ডঃ কায়সার উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনাকে সাবধান হতে বলবো। তবু আপনার যা ধারণা সেটা আমাকে বলতে পারেন।'

'আমার মনে হয় এটা আবেগজনিত অপরাধ।'

'ডঃ কায়সার, এখানে অনেক ধরনের আবেগ রয়েছে; ঘৃণা, লোভ, ভয়, অর্থলিপ্সা।'

'না আমি প্রেম-সংক্রান্ত আবেগের কথা বলছি।'

'আনিস-রেহানার কথা বলছেন? সে তো আমরা অনেক আগেই ভেবেছি। তবে এখন ব্যাপারটা আর খাপ খাচ্ছে না।'

'এটা তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল,' বললেন ডঃ কায়সার।

একুশ

'জানেন, বুয়া আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো।' ভীত চোখে ডঃ কায়সারের দিকে তাকিয়ে হাসি বললো, 'সে বলতো, তাঁকেও বিশ্বাস না করতে।'

'ওসব কথা আর ভেবো না। ভুলে যাও। এখন তোমরা মুক্ত। নির্দোষ যারা, তাদের ওপর আর সন্দেহের ছায়া নেই।' ডঃ কায়সার বললেন।

'টিনা ভালো হয়ে উঠবে। বিপদ কেটে গেছে। ও মাসুদকে ভালবাসে, তাই না?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বোধহয়।' অবাক গলায় বললো হাসি, 'আমি কখনো ভাবিনি। কারণ যদিও আপন ভাই বোন নয় তবু ওরা ও ভাবেই মানুষ হয়েছে।'

'হাসপাতালে জ্ঞান ফিরলে টিনা বলেছে, 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে···' কেন জানো?'

'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে···?' ভ্রূ কুঁচকালো হাসি, 'ও, এটা তো সেই ছড়াটা—'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। খাজনা দেবো কিসে?'

'বুয়া ছোটবেলায় এই ছড়া বলে আমাদের ঘুম পাড়াতো।'

'ওহ!' ডঃ কায়সার যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

'টিনা আর মাসুদ বোধহয় বিয়ে করে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যাবে।'

'খুব ভালো কথা। তুমিও এবার সুখী হবে। তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হাসি। এবার ডাঃ মামুন হায়দারকে বিয়ে করতে আর অসুবিধে থাকলো না।'

'বিয়ে? মামুনকে?' ভীষণ অবাক হলো হাসি, 'মামুনকে তো আমি বিয়ে করছি না।'

'তুমি তাকে ভালবাসো!'

'না। এখন বুঝতে পারছি, তাকে আমি ভালবাসি না। সে আমাকে বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছিলো আমি খুন করেছি। অথচ তার তো জানার কথা, বোঝার কথা।' হাসি ডঃ কায়সারের দিকে বড় বড় চোখ মেলে বললো, 'আপনি জানতেন আমি নির্দোষ। আমার মনে হয় আপনি আমাকে বিয়ে করলে আমি সুখী হবো।'

হাসির কণ্ঠ আবেগ ও ছেলেমানুষীতে ভরা।

ডঃ কায়সার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু হাসি, আমার অনেক বয়স। তুমি…'

'আপনি যদি না চান…' হাসি দ্বিধা ভরা কণ্ঠে বললো।

'আমি তোমাকে চাই, হাসি!'

সমাপ্ত

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan